পরলোক-প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বামী অমলানন্দ সরস্বতী

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
"দশহরা" ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬
॥ দ্বিতীয় প্রকাশ ॥

রথযাত্রা ১৮ আষাঢ়—১৩৬৮

[মূল্য—দশ টাকা

প্রকাশক :
শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ সরস্বতী
আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
(আশ্রম বিভাগ)
হালিসহর : ২৪:পরগণা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা

*

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

*

সর্বোদয় বুক ষ্টল
হাওড়া স্টেশন, হাওড়া

*

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ—

১। উপনিষদের দ্যুতি—৭.৫০
২। স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব—১০.০০
৩। সরল কঠোপনিষদ—১০.০০
৪। আদর্শ-বন্ধু (ছোটদের)—১.০০

মুদ্রাকর
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"পরলোক-প্রসঙ্গ" ১৩৮৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশ হওয়ার পর অতিক্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন জনের নিকট হতে পুনর্মুদ্রণের আবেদন আসে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করা হয়েছে। তাছাড়া নতুন খণ্ডে নতুন অধ্যায়ও সংযোজিত হল।

প্রথম খণ্ড—জন্ম-মৃত্যু, দেহ-যন্ত্র ও শক্তি, জীবাত্মার উত্তরণ, পুনর্জন্ম ও শাস্ত্রোক্ত জন্মান্তর, পিতৃযাণ ও দেবযান, অদৃশ্য জগৎ, শব সংস্কার প্রভৃতি ২২টি নিবন্ধের সমাবেশ।

দ্বিতীয় খণ্ড—আত্মার বিবিধ রূপ, গতিবিধি, মিডিয়ম-বিজ্ঞান, প্রেতাত্মার সহিত যোগাযোগের বিভিন্ন উপায়, ভগবান রামকৃষ্ণ কথিত ও স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব বর্ণিত জন্মান্তরবাদ, প্রেতাত্মা পরিচয়, স্বর্গ-নরকাদির বিভিন্ন শাস্ত্রোক্ত বর্ণনা, শাস্ত্রোক্ত কর্মফল ও গতি প্রভৃতি ১৭টি নিবন্ধের সমাবেশ।

তৃতীয় খণ্ড—স্বপ্নজগৎ, অন্তর্জগৎ, বিভিন্ন মনীষীগণ কর্তৃক জন্মান্তর বর্ণন, আত্মহত্যার ফল, মৃত্যুর পর আত্মার প্রভাব, মৃত্যুর লক্ষণ ও নানা ঘটনা প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত।

গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের
নিবেদন

'পরলোক-প্রসঙ্গ' পরলোকেরই কথা। ইহা বড়ই দুজ্ঞের্য় ও রহস্যপূর্ণ। সমগ্র সৃষ্টিতে কত জ্ঞাত-অজ্ঞাত, দৃশ্য-অদৃশ্য, জড়-সূক্ষ্ম প্রভৃতি জীব-জগৎ আছে তার সীমা-সংখ্যা নাই। এই সমস্ত বিভিন্ন জীবজগতের পরিবেশ, আবহাওয়া এবং দেহের ধাতুগত উপাদানের পার্থক্য আছে। যেমন এই ভূলোক কিনা পৃথিবী-লোকের পরিসর ও জীবদেহ ক্ষিতিপ্রধান, ভূর্বলোক অপ্‌প্রধান, স্বর্লোক তেজপ্রধান এমনি সমস্ত লোকে। তবে এই সমস্ত লোকের যে সমস্ত বিভিন্ন ধরণের জীব-প্রাণী আছে, তারা চেতনার ক্রমোন্নতি ও অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযাত্রা করতে পারে। ইহলোকের জীবদেহ ধ্বংস হ'লে সূক্ষ্মদেহে তাকে লোকান্তরে যেতে হ'তে পারে, আবার কিছু কালের বিলম্বতায় ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহও হ'তে পারে। এ সমস্ত নির্ভর করবে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও কর্মসূত্রের উপর। দেহ গঠিত হয় ভাব ও সংস্কারানুযায়ী। ভাব ও সংস্কার হ'ল সূক্ষ্ম। জীবের মৃত্যুর পর কর্ম, ভাব, সংস্কার, বৃত্তি এগুলি সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করে থাকে। লিঙ্গদেহ আবার স্থূলদেহে ফিরে আসে। এমনিভাবে জীবের চলছে 'জন্মান্তর'।

জন্মান্তরের স্মৃতি জীবের মনে থাকে না। একে বলে আত্মবিস্মৃতি। আত্ম-বিস্মৃতি না থাক্‌লে জন্মান্তরের প্রভাব থাকে না। যেদিন হ'তে আত্মস্মৃতি চিত্তে জাগ্‌তে থাকে, আত্মার আবরণ বিদূরিত হ'তে থাকে, তখন হ'তে পূর্ব পূর্ব জন্মের ইতিবৃত্তগুলি চেতনায় জাগরূক হয়—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদেরই হয়েছে এবং হয়। তাছাড়াও জাতিস্মরদের কথা ত' আছেই। কাজেই ইহলোকের মত পরলোকও অবশ্য স্বীকার্য।

পরলোকের ইতিবৃত্ত পরলোকতত্ত্ববিদ্‌ ও মনীষীরা কিছু কিছু পরিজ্ঞাত হয়েছেন। মিডিয়ম-প্রক্রিয়া মাধ্যমে আত্মাকে আকর্ষণ করে এনে যে সকল প্রশ্ন-উত্তর পাওয়া যায় তার বহু-প্রমাণের অভাব নাই। তবে এ সম্বন্ধে কেহবা হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, দর্শন করেছেন, কেহ বা পরম্পরাক্রমে শুনে আস্‌ছেন। এগুলির সমস্তই অসত্য বা মিথ্যা বলে অস্বীকার করা যায় না। যদিও সব ঘটনাই যে সত্য তা' ঠিক করে বলা কঠিন।

এই গ্রন্থে পরলোকের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে শুধু ভৌতিক আত্মায় অলৌকিক ঘটনাসকলকে একমাত্র গ্রন্থের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। জীবাত্মার বন্ধন-মুক্তিরূপ বিভিন্ন দিক্‌গুলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া দেহের মধ্যে কিভাবে সূক্ষ্মভাবে জীবাত্মা অবস্থান করে, দেহ হ'তে বহির্গমনের গতিপথ, আত্মমুক্তির প্রকারভেদ, প্রযুক্তির গতিপথে বাধা-অন্তরায়গুলির দিকদর্শন, চৈতন্য-শক্তির প্রগতি প্রভৃতি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি আলোচনার কারণ হ'ল ইহাও পরলোক তত্ত্ব রহস্যের মূলভিত্তিস্বরূপ বা পটভূমিকা।

স্রষ্টাকে পরতত্ত্ব, নিরপেক্ষতত্ত্ব ধরে অনন্ত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যে সমস্ত দিগন্তের উদ্‌ঘাটন হয়েছে সেগুলির রহস্য-নিরূপণ করা বা সম্যক্ বুঝা সহজ-সাধ্য নয়। এ সম্বন্ধে মহাজনরাই নীরব থেকে গিয়েছেন বা বলেছেন—পরতত্ত্ব জটিল, দুরধিগম্য, রহস্য বিজড়িত। এ কথার মানে এই নয় যে তাঁরা কিছু জ্ঞাত নহেন। তাঁরা জানেন কিন্তু অনন্ত জ্ঞানকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করে খণ্ড করতে চান না এই যা।

'পরলোক সম্বন্ধে' পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদ্‌দের থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী মহাজনদের অবদান অনেক অনেক বেশী। পরলোক-রহস্যের কথা তাই ভারতীয় ধর্মগ্রন্থাদিতে অভাব নাই। গীতা, ভাগবত, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। ঠিক ঠিক বিষয়গুলি উপস্থাপিত ও ধারণা করতে পেরেছি কিনা জানি না—তা' পাঠক সুধীবৃন্দেরই বিচার্য।

জন্মান্তরের খবর জানবার-শুনবার অভীপ্সা অনেকেরই থাকে। কিন্তু মূল গ্রন্থগুলি ক্রয় করে পাঠ করার সামর্থ ও সময়-সুযোগ অনেকের হয় না। কাজেই জানাও হয় না। এ জানা যদিও সামান্য জানা তবুও চেতনায় যে কিছুক্ষণের জন্যও একটা ছাপ পড়ে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রচ্ছদ-পটের চিত্রটি চতুর্দশ ভুবনের আভাসমাত্র, চতুর্দিকে অনন্ত মহাকাশে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র বিদ্যমান। শিল্পীর ইহা অনুদর্শনমাত্র।

পরিশেষে, পরতত্ত্ব ও পরলোকের সম্যক্ জ্ঞাতা ও সকল জীবের পরম কল্যাণকামী, মুক্তি প্রদাতা সেই আচার্যরূপী দেবতা যমরাজের পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক নমস্কার জানাই—'ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে'।

—স্বামী অমলানন্দ

দিব্য-বাণী

* * * যথাহনান্যনু পূর্ব্বং ভবন্তি—ঋগ্বেদ ১০/২/৫

"দিবসগুলি যেমন যথানিয়মে অপর দিবসে অনুবর্তন করে, ঋতুসকল যেমন পর্যায়ক্রমে পুনরাবর্তিত হইয়া থাকে, অনুগামী যেমন পূর্বগামীর অনুসৃত পথ ত্যাগ করে না, হে বিধাতঃ আপনি তদ্রূপ এই মৃত ব্যক্তিদের জীবন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুন।"

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ গীতা ৯/২০-২১

"সেইসব পুণ্যকারী জীবসকল পুণ্যফলে স্বর্গগমনপূর্বক দেবভোগ্য বস্তু ভোগ করে। পুণ্যক্ষয়ে ভোগ শেষে মর্তলোকে পুনরায় ফিরে আসে। যে সকল ব্যক্তি বেদত্রয়-বিহিত সকাম-কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করে সেই কামকামী ব্যক্তিগণকে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হয়।"

বিষয় সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড

আত্মার বিবিধ রূপ

ইহলোক-পরলোক সমস্তই আত্মা কর্তৃক বিধৃত। আত্মা সূক্ষ্মতত্ত্ব। এই আত্মা গুণযুক্ত হলে ইহার বিকার সত্তার সৃষ্টি হয়। গুণযুক্ত হয়েই আত্মা মহৎ, অহংকার, মহাভূতাদি সমস্তই রূপ পরিগ্রহ করে। জীব, কর্ম, সংস্কার, বৃত্তি, জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি সেই আত্মারই বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ।[১] এইগুলি আত্মার স্বদৃশ পরিণাম।

আত্মাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়। সকল পরিণামের উৎপত্তি কেন্দ্র। কখন সুপ্ত কখনও প্রসুপ্ত কখনও প্রকাশিত। সেজন্য আত্মাকে নির্গুণ ও গুণময় বলা হয়েছে। তিনি গুণযুক্ত হয়েও গুণাতীত, তিনি অনু হতে অনু আবার মহৎ হতে মহীয়ান। তিনি সকল বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু তাঁর জড়রূপ কোথাও, কোথাও বা চেতনরূপ।

তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, সৃষ্টির সর্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন আবার প্রলয়ের পরেও আত্মস্বরূপে তিনিই থাকবেন। সৃষ্টিরূপটি তাঁর চতুষ্পাদের একটি পাদ মাত্র। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর একপাদ। তিনিই একপাদে নেমে আসছেন—আবার ত্রিপাদে ফিরে যাচ্ছেন। ব্রহ্ম বা আত্মা জীব হচ্ছেন অর্থাৎ ঈশ্বর→বায়ু→অগ্নি→অপঃ→ক্ষিতি→ওষধি→অন্ন→রেতঃ→জীব। আবার জীব হতে চেতনার উর্ধ্ব পরিণামে পরমাত্মায় হয় সহবস্থিত।[২] এই তাঁর সংসার চক্রের নিয়ত লীলাভিনয় বা লীলাভিযান।

কাজেই আত্মাকে জানাই প্রথম কর্তব্য। এই আত্মার কথা তাঁরাই বলতে পারেন যাঁরা দিব্যচক্ষু দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেছেন। এই আত্মতত্ত্বকে বলা হয় অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৭

২। তৈত্তিরীয়

আত্মাকে নিয়েই আমরা বেঁচে আছি, আত্মাকে নিয়েই লোক-লোকান্তরে পাড়ি দিচ্ছি আবার কর্মফল বহন করে নানা জন্ম পরিগ্রহ করছি। কিন্তু অন্ধজীব আমরা তাকে ধরতে পারছি না, বুঝতে পারছি না, দেখতেও পাচ্ছি না।

এই আত্মতত্ত্বের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে ও মহাপুরুষদের সন্নিকট পাওয়া যায়। বিভিন্ন শাস্ত্রে যেমন বেদান্তে ব্রহ্ম, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা বা আত্মা, সাংখ্যে পুরুষপ্রকৃতি, প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তর্দৃষ্টি নাই বলে সেই আত্মা রয়েছে অদর্শনীয়। যেমন উদরের মধ্যে শত শত নাড়ীসমূহ বিদ্যমান বা শরীরের প্রতি অঙ্গে শতশত শিরা উপশিরা, মস্তিষ্কে হাজার হাজার স্নায়ুতন্ত্রী রয়েছে যা এই চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না। X-Ray (যান্ত্রিক সাহায্যে) চক্ষুতে সেগুলি ধরা পড়ে। সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে আমরা যেগুলিকে অস্বীকার করি বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে সেই বিষয় বস্তু বা ঘটনার মধ্যে অনেক কিছুই তত্ত্ব ও তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। সেই হিসাবে আমাদের দেহের মধ্যে এই চর্মচক্ষুর অদৃশ্য শিরা উপশিরাই মাত্র বিদ্যমান নাই উহার মধ্যে আরো অনেক কিছুই আছে যা সূক্ষ্মদৃষ্টি দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বা সেগুলিকে দর্শনও করা যেতে পারে।

আমরা সাধারণতঃ বুঝতে পারি যে শিরা উপশিরা, রস রক্ত প্রভৃতি থাকলেই যে জীব প্রাণী সজীব সচেতন কর্মক্ষম থাকবে তার নিশ্চয়তা নাই। শবদেহে ঐগুলি থাকে কিন্তু শবদেহ অচেতন, জড়। সেই হিসাবে স্থূল উপাদান, স্থূল ইন্দ্রিয়, স্থূল অঙ্গই জীবের সচেতনতার একমাত্র হেতু নয় সূক্ষ্ম ও কারণময় উপকরণও আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে জীব মানুষ বা যেকোন চেতন পদার্থের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সেই কথাই শাস্ত্র, মহাজনরা বলেন বা দর্শন করিয়ে দেন।

প্রথমতঃ, আত্মার কথা ধরা যাক। আমরা আগেও বলে এসেছি

আত্মা এমন একটি বস্তু যে, তাকে ধরা দুরূহ। আমরা যেটিকে ধরতে বা দেখতে পাই সেটি হল আত্মার প্রপঞ্চাত্মক সত্বা। যেমন সোনায় খাদ মিশ্রিত না-করলে অলঙ্কার তৈরী হয় না তেমনি প্রপঞ্চ হল অবিদ্যাময় পাঞ্চভৌতিক খাদ, যার দ্বারা জীবদেহ বা বিশ্ব সৃষ্টি হয়। ইহাও আত্মারই একটা অবিদ্যার দিক যার স্থায়ীত্ব একটি সীমিত স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে বাঁধা। এই অবিদ্যার গুণই হল বিদ্যাকে ঢেকে রাখা। মেঘ দিয়ে সূর্য ঢাকা, কালিমা দিয়ে আলো ঢাকা যেমন, তেমনি দেহ, মন দিয়ে আত্মাকে ঢাকা। এইপ্রকার হল অবিদ্যার কাজ বা গুণ।

তাহলে বিদ্যা বা আলোর বিপরীত সত্তাই হল অবিদ্যা বা অন্ধকার। আত্মার এই দুই গুণ থাকার জন্যই মানুষ কখনও সুখ ভোগ করে, কখনও দুঃখ ভোগ করে, কখনও শান্তি কখনও অশান্তি ভোগ করে, কখনও সুকর্ম করে, কখনও কুকর্ম করে, কখনও অধর্ম করে কখনও ধর্ম করে। এই-ই হল সাধাবণ আত্মশক্তির ক্রমোবিবর্তন।

জাগতিক কোন বস্তু, পদার্থ বা জীব সেজন্য এককভাবে পূর্ণ নয়। এক সংশয়বহুল জ্ঞান নিয়েই সাধারণকে কাল কাটাতে হয়। এর কারণই হল অবিদ্যা, অবিদ্যার স্থায়ীত্ব একটা নির্দিষ্ট কালে বাঁধা। বহির্জাগতিক ও আন্তর্জাগতিক ক্রমোবিবর্তনের ধারায় জীব একদিন অন্ধকারের পথে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা করে। ইচ্ছা ধীরে ধীরে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে একদা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে প্রপঞ্চাত্মাক সংসার, দেহগেহ, ধনজন, আত্মীয়স্বজন সব কিছুকে পরিহার করে নচিকেতার মত অভিযাত্রা করে আত্মরাজ্যের দিকে। ঋষিরা বলেছেন—এই জগৎ হল তাঁর একপাদ মাত্র। বাকী ত্রিপাদ অব্যক্ত অমৃতে পরিপূরিত। সেখানেই স্বরূপের পরিপূর্ণতা, সংসারের চিরন্তন নিবাস স্থান, অবিদ্যার, অজ্ঞানের চির অবসান ক্ষেত্র, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দের দ্বন্দ্বাতীত ভূমি। সেখানে পৌঁছাতে পারলে চিরশান্তি সুখ অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়।

এখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আত্মায় আস্থা না আসার কারণ হল অবিদ্যা বা মায়া। অবিদ্যার এক প্রভাব আছেই। সৎ মানুষের এক প্রকার শক্তি, অসৎ মানুষের আরেক প্রকার শক্তি। দুইই শক্তি যদিও কিন্তু দুয়ের গুণগত প্রভেদ আছে। সৎসত্ত্বা অসৎ দ্বারা প্রভাবিত বা আক্রান্ত হতে পারে কখনও কখনও কিন্তু অসৎ-এর স্থায়ীত্ব নাই বলে বাধিত হয়ে পড়ে। মেঘ সামান্যক্ষণের জন্য সূর্যের আলোকে বা পৃথিবীকে আবরিত করে সূর্যকে আবরিত করতে পারে না। তেমনি জ্ঞানসূর্যও অবিদ্যাদ্বারা আক্রান্ত হলেও বেশীদিন বা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। এখন সেই আত্মার আবরণগুলির কথাই শাস্ত্রকার বলেছেন। খাপ যেমন তরবারিকে ঢেকে রাখে তেমনি পাঁচটি কোষরূপ আবরণদ্বারা আত্মস্বরূপ ঢাকা রয়েছে। পঞ্চকৃত স্থূলভূত দ্বারা অন্নময়কোষ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণদ্বারা প্রাণময় কোষ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনদ্বারা মনোময়কোষ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিদ্বারা বিজ্ঞানময়কোষ, সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানরূপ কারণ শরীর জীবের আনন্দময় কোষ গঠিত। এই পাঁচটি আবরণরূপ খাপদ্বারা জীবের অন্তরে আত্মা আচ্ছাদিত রয়েছে।

তাছাড়া আমরা আগেও আলোচনা করে এসেছি দেহ বলতে এই স্থূল দেহটিই মাত্র নয়। পঞ্চকোষ দ্বারা একই ব্যক্তির তিনটি দেহ রয়েছে। স্থূলদেহ অন্নময় Corporeal Soul of the materialist, সূক্ষ্মদেহ প্রাণময় ও মনোময় কোষ individual Soul of the realist, কারণ-দেহ বিজ্ঞান ময় কোষ Supreme Soul of the idealist। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ পেতে হলে এই দেহগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। ত্রিবিধদেহের বিবিধ কর্ম, ভাব, চাহিদা, ক্ষুধা আছে। দেহ অনুযায়ী ভাব ও কর্মের গতি হয়। সেই সমস্ত ভাব ও কর্মকে অতিক্রম করার জন্য নানা বিধিবিধান, যোগ-যাগ, নীতি নিয়মের বিধান পাওয়া যায়। নিয়মগুলি পালন করলে ধীরে ধীরে প্রপঞ্চাত্মক

ভাববৃত্তিগুলির রূপান্তর ঘটতে থাকে কিনা অন্তরের দিকে গতি, অন্তর কিনা আত্মার দিকে গতি হয়। আত্মার দিকে গতি হলে দিব্য মনবুদ্ধিচেতনার বিকাশ ঘটে, দিব্য ধর্মভাব অন্তরে জেগে ওঠে—আত্মায় আস্থা স্থাপিত হয়।

মূলতঃ আত্মার অবস্থিতিতে দেহত্রয় অবস্থিত। আত্মাকে ঘিরে দেহ ত্রয়ের নিরন্তর বিবর্তন চলছে। দেহকে ঘিরে প্রপঞ্চাত্মক উপাদানগুলির বিবর্তন চলছে, প্রপঞ্চের সূক্ষ্মতম অংশ মন, এই মনকে ঘিরে প্রপঞ্চভূতের গুণগুলির বিবর্তন চলছে, গুণগুলিকে ঘিরে বিভিন্ন ভাবের বিবর্তন চলছে। জীবাত্মাকে ঘিরে তাই বলতে পারা যায় দেহ, মন, ভাব ও চৈতন্যের অনন্ত পরিক্রমা। কোনটিই অস্বীকার করা যায় না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেহের অবস্থাগুলি আমরা স্মরণ করতে পারি। দেহ যখন সজাগ সচেতন তখন বলা যায় জাগ্রৎ। জাগ্রৎএ দেহ জ্ঞান স্পষ্টই বর্তমান থাকে। কিন্তু নিদ্রায় দেহকে দেখা যায় না, নিদ্রা ভঙ্গে দেহকে দর্শন করে দেহকে বিশ্বাস হয়। আবার স্বপ্ন সময় দেহমন জ্ঞান থাকে না। স্বপ্নকেই সত্য বলে মনে হয়, সুষুপ্তির সময় স্বপ্ন জ্ঞানও থাকে না। জাগ্রতের স্থূল বিষয়বস্তুগুলি স্বপ্নে দেখা নাও যেতে পারে বা দেখা গেলেও তা অন্যপ্রকার। স্বপ্ন, সুষুপ্তির সময় দেহ নাই, জগৎ নাই, আত্মা নাই বলতে পারা যেতে পারে কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় ফিরে এলেই দেহজ্ঞান, জগৎ জ্ঞান ফিরে পাচ্ছি।

এমনি ভাবে জীবের চেতনার ভূমি বা অবস্থান অনুযায়ী জ্ঞানেরও প্রকার-ভেদ হয়ে যাচ্ছে। ব্যষ্টিগত সাংসারিক জীবনে আমরা দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন করে চলছি। যেদিন আত্মজ্ঞান লাভ করা যাবে, সেদিন জন্মজন্ম ধরে এই দীর্ঘ স্বপ্নের অবসান ঘটবে। আমরা প্রপঞ্চাত্মক ভূমিতে, জড়াত্মক জগতে অবস্থান করছি বলে সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকগুলিকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি হচ্ছে, আত্মজগতের দিকে মনপ্রাণের গতি নাই, আত্মার

প্রতি দৃষ্টি নাই, আত্মাতে বিশ্বাস নাই। স্বপ্নে যেমন দেহকে মনে পড়ে না, জাগ্রতে যেমন স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় জগতের ঘটনা দর্শন করা যায় না অথচ এগুলি সবই বর্তমান রয়েছে।

এই আত্মাকে উপলব্ধি বা জানার জন্য রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, লয়যোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি অসংখ্য উপায় রয়েছে। এই উপায়গুলি প্রকারন্তরে প্রপঞ্চ হতে কিনা পঞ্চভূত হতে নিজকে পৃথকীরণের প্রণালী।

তুইএর মধ্যে এক মিশে একাকার হয়ে তুই হয়ে গিয়েছে। তুইএর মধ্যে এসে এক নিজের স্বরূপ হারিয়েছে। এখন তুই হতে এককে বেড় করে আনাই হল সাধনা। বুদ্ধি করে কৌশল করে নিজের মধ্যে আত্মাকে বেড় করে নেওয়াই হল সকল যোগের মৌল তাৎপর্য।

আমরা ভ্রমবশতঃ দেহ মন, বিষয়কেই মনে করি আত্মা, কিন্তু মুখে বলি আমার দেহ, আমার হাত, আমার পা। এখানে আমার যদি হাত হয় তবে আমি হাত নই, আমি পা নই। আমি একটি স্বতন্ত্র বস্তু, আর আমার হাত পা মুখ ইত্যাদি হল আমার বিষয়। আমি হাত আমি পা একথা আমরা কখনও ভ্রমেও বলি না। সেই আমি হল আত্মা। আত্মাই যন্ত্রী, চালক, দেহ যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রীকে জানাই হল যোগ।

সেই আত্মাকে সহজে এই চক্ষু কর্ণ মন দিয়ে দেখতে শুনতে বুঝতে পারি না। কোনোপনিষদ বলছেন—তিনিই কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, সুতরাং জ্ঞানী বিবেকীরা ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করে এই সমস্ত হতে মনকে নিবৃত্ত করে অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। সেই যে আত্মভূমি অমৃতভূমি সেখানে এই প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টি যায় না, বাক্য ও মন গমন করে না। বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু তাঁর দ্বারা শব্দ প্রকাশিত হয়, মন যাঁকে চিন্তা করতে পারে না কিন্তু তার শক্তিতে মন শক্তিমান হয়, চক্ষু ও কর্ণ

যাকে দর্শন ও শ্রবণ করতে পারে না কিন্তু তাঁর দ্বারা চালিত হয়ে চক্ষু দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে, তিনিই ব্রহ্ম। এই হল আত্মতত্ত্বের দিক-নির্দেশনা। আত্মাকে দর্শন করতে হলে এই দেহেন্দ্রিয় হতে মনকে গুটিয়ে অন্তরেন্দ্রিয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারলে তবেই দিব্যচক্ষুদ্বারা তাঁর দর্শন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। আত্মতত্ত্বও সেই বিরাট দিক যা এই চর্ম চক্ষু দর্শনের উপযোগী নয়। এই সব নানা কারণ, আত্মজ্ঞান লাভ বা আত্মাকে জানার ইচ্ছা মানুষের হয় না। কালের বিবর্তনে মনের বা ভাবের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অন্তশ্চেতনার বিকাশ প্রকাশ একদিন ঘটে। মানুষের মধ্যে একদিন জেগে ওঠে আত্মজিজ্ঞাসা, দেহ ও জগৎ রহস্য ; জন্ম ও মৃত্যু রহস্য জানার অভীপ্সা। ঋষি, যোগী, মহামানবদের মধ্যে এই চেতনা জেগেছিল। সেজন্যই তাঁরা বলে গেছেন বিশ্ববাসী মাত্রেই অমৃতের সন্তান। অমৃতত্ব লাভ করাই জীবের জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষুধা (hunger for the Absolute) শরীরধারী মানুষের এই আত্মক্ষুধার চিরনিবৃত্তি হতে পারে একমাত্র আত্মজ্ঞানে। জানাই হল জ্ঞান। ভগবান সেই আত্ম-উপদেশই দিয়েছেন—'অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। বিনাশ-মব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।' যিনি উৎপত্তিশীল এই জগৎব্যাপী রয়েছেন তাঁকেই আত্মস্বরূপ অবিনাশীরূপে জেনো। কেহই সেই অব্যয় আত্মাকে বিনাশ করতে সক্ষম নয়। আত্মাকেই বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করা হয়।

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বশে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।"

ভাগবত বলেছেন—

সেই অদ্বয় আত্মাকে বা ব্রহ্মকেই ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান বলে অভিহিত

করা হয়।[১] এখন এই আত্মার ক্রিয়া বা গুণ ও অবস্থান প্রভৃতি অনুধ্যান করতে হবে।

আগেও বলা হয়েছে আত্মা এক এবং অদ্বয়। স্বরূপতঃ আত্মার কোন গুণ পরিণাম বা বিবর্তন নাই। একদিকে তাঁকে বলা যায় গতিহীন, নিশ্চল, অন্যদিকে বলা যায় মন অপেক্ষাও গতিশীল।[২] কথাটি দ্ব্যর্থক। আচার্য শঙ্কর বলেছেন ব্রহ্ম বা আত্মার দুটি ভাব। একটি নিরুপাধিক আরেকটি সোপাধিক। নিরুপাধিক আত্মা সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। সোপাধিক আত্মাই হল বেগবান, শক্তিমান, প্রকাশমান। মন সমন্বিত যে আত্মা তাই সোপাধিক। এই আত্মার ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছাও আছে। যেমন মানুষের মধ্যে কখনও কামনাযুক্ত মন কখনও কামনাশূন্য মন। কিন্তু যখন কামনাযুক্ত মন তখন তাঁর কামনা প্রকাশের গতি এত দ্রুত যে এই প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় তাঁকে ধরতেই পারে না বরং তাঁর কম্পনে বা স্পন্দনে ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশ পায়। এখানে একটা বিষয় মনে হতে পারে যে আত্মা বিভিন্ন দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বলে দেহাত্মবাদী মানুষের বা জীবের মনে হতে পারে মনের দুঃখ কষ্ট ভোগ হলে আত্মারও দুঃখ কষ্ট ভোগ হয় কিন্তু প্রকৃত ইহা মনের বিকার মাত্র আত্মার কোন দুঃখ কষ্ট নাই। মন সমন্বিত আত্মা চলেন, মনশূন্য আত্মা নিশ্চল, তিনি নিকটে, তিনি দূরে, তিনি অন্তরে তিনি বাইরে, তিনি ব্যক্তে, তিনি অব্যক্তে। তিনি বিশ্বচরাচরে, তিনি বিশ্বাতীতে।[৩]

তিনি অক্ষর হয়েও ক্ষর। তিনি যখন অক্ষর তখন ভূমা কিনা বৃহৎ

১। বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানং অদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥ ১।২।১

২। ঈশোপনিষদ্—৪

৩। ঈশোপনিষদ্—৫, ৬, ৭

আবার তিনি ক্ষররূপী জীব। কিন্তু অক্ষর পুরুষ হতেই ক্ষর জীবের উৎপত্তি। সেই অক্ষর পুরুষ সত্যস্বরূপ। সুদীপ্ত অগ্নি হতে যেমন সহস্র সহস্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তেমনি অক্ষর পুরুষ হতেও সহস্র সহস্র জীবের সৃষ্টি হয়।[১]

গুণান্বিত আত্মা জীব। গুণময় জীব ফললাভেচ্ছু। ফললাভের বাসনা জীবকে কর্মমুখী করে। বিবিধ ফলভোগের জন্য বিবিধদেহ রচনাপূর্বক আত্মাই সংসারে বারবার বিচরণ করে।[২] প্রতি দেহে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হৃদয়-পুণ্ডরীক আকাশে সেই আত্মা বাস করে, তিনি সূর্যের ন্যায় জ্যোতিস্বরূপ, সংকল্প, অহংকারযুক্ত ও ইচ্ছাদ্বেষাদি জরামৃত্যু প্রভৃতি পরিমাণযুক্ত হয়ে লৌহ কণ্টকের অগ্রভাগের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র।[৩] ইহার পরিমাণ অতীব ক্ষুদ্র। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করে, তাকে আবার শতভাগে বিভক্ত করলে যে সূক্ষ্ম পরিমাণ হয় সেই পরিমাণই হল জীবাত্মার পরিমাণ।[৪]

সেই জীবাত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, নপুংসকও নয়। কর্মবশে কামনা-বাসনা অনুসারে দেহ তৈরি করে নেয়।[৫]

সেই জীবাত্মা বাসনাযুক্ত হয়ে বিষয়ের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে খাদ্য পানীয় ভোজনপূর্বক দেহকে পরিপুষ্ট করে তোলে।[৬] সেজন্য দেহাত্মবাদী জীব সাধারণত ভোগবাদী হয়, আত্মবাদী হতে পারে না। আত্মবাদীর ভাবনা দেহ বা বিষয় নয়—অশরীরী, অবিষয় বিশুদ্ধ আত্মাই তাঁর লভ্য বা লক্ষ্য। এই জন্য আত্মবাদীর পুনর্জন্ম হয় না।[৭] কিন্তু ভোগবাদীর চিন্তা-ভাবনা কাজকর্ম সবই ভোগমুখী। দেহটি ভোগ গ্রহণের একটি যন্ত্র মাত্র। ঋষিরা ইহাকে দেহপুর বলেছেন। একাদশ দ্বার বিশিষ্ট (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি, গুহ্য ও মুত্রদ্বার) পুরে কিনা নগরে নিত্য অপরিবর্তনীয় চৈতন্যস্বরূপ,

---

১। মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।১ ২। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৭।

৩। ৫।৮। ৪। ৫।৯। ৫। ৫।১০। ৬। ৫।১১। ৭। ৫।১৪।

জন্মরহিত আত্মা অবস্থিত। দেহপুরের বা নগরের স্বামী হলেন আত্মা।[১] দেহস্থিত আত্মাই চৈতন্য উৎপাদক। প্রাণবায়ু সহযোগে ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে তোলে এই আত্মাই। আত্মচৈতন্য ইন্দ্রিয়াদিতে প্রতি-ফলিত হয় বলে দেহাত্মবাদী দেহ ইন্দ্রিয়কেই আত্মা বলে মনে করে থাকে। যেমন আকাশের সূর্য তরঙ্গায়িত জলে শত শত সূর্য মনে হয় কিন্তু জলে মাত্র সূর্যের প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, উহা মূল সূর্য নয়। তেমনি দেহ, মন, চিত্ত, অহংকার অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তিতে আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়ায় সাধারণজ্ঞানে মনে হয় ঐগুলি আত্মা, কিন্তু ঐগুলি আত্মা নহে। ঐগুলি মনের বিকার। কারণ জীব যখন স্বরূপ লাভের জন্য আত্মার বা পরমাত্মার ধ্যান করে তখন ঐ অবিদ্যার অজ্ঞানের, অহংজ্ঞানের বিনাশ ঘটে। বিনাশ ঘটে বলেই মুক্ত পুরুষের চিত্তে সুখ-দুঃখ, বেদনা-হতাশা, জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু থাকে না। কারণ মুক্ত পুরুষ আত্মাকে শুধু দেহতেই অনুভব বা দর্শন করেন না। তিনি আত্মাকে সর্বভূতে সর্বলোকে, সর্বাবস্থায়, সর্বস্বরূপে দর্শন করে থাকেন।

ঋষি বলেছেন—ইনি সূর্যরূপে দ্যুলোকে, সর্বলোকের বসুরূপে, অন্তরীক্ষে বায়ুরূপে, অগ্নিরূপে, পৃথিবীরূপী, কলসীর সোমরূপে, অতিথি ব্রাহ্মণরূপে, মনুষ্যে, সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থে, আকাশে, শঙ্খমৎসাদিরূপে, ব্রীহিযবাদিরূপে, যজ্ঞরূপে পর্বত ও নদীরূপে। এই সমস্তরূপে তিনি বিরাজিত বলে তাঁর বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়ে থাকে। শুচিসৎ, বসুসৎ, অন্তরিক্ষসৎ, হোতা, বেদিষৎ, অগ্নি, দুরোণসৎ, নৃষৎ, বরসৎ, বোমসৎ, অব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা এই প্রকার বহু নাম করণ করা হয়ে থাকে।[২]

দেহের স্বামী আত্মা। দেহ যন্ত্র বা রথ আত্মা যন্ত্রী বা রথী।

১। কঠোপনিষৎ ২।২।১।

২। কঠোপনিষৎ ২।২।২

কিন্তু দেহের সঙ্গে এই আত্মার সম্বন্ধ ও কার্য বহু প্রকারের। দেহের স্থায়ীত্ব বা দেহের শক্তি হল প্রাণ। এই প্রাণ আত্মাই বটে তবে ইহাকে ঋষিরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেহে পঞ্চপ্রাণ অবস্থিত। প্রাণ কিনা বায়ু। বিশ্বপ্রাণই উদরস্থ হয়ে দেহ প্রাণকে পরিচালিত করছে। তাই প্রাণবায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম করে, অপানবায়ু মলমূত্র-নিঃসারণরূপ কার্য করে, সমানবায়ু ভুক্তদ্রব্যকে জীর্ণ করে, ব্যানবায়ু বাক্য উচ্চারণ করতে সাহায্য করে, উদানবায়ু স্নায়ুর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। আত্মার শক্তিতে ইহারা স্ব স্বস্থানে অবস্থানকরতঃ কার্য সম্পাদনাদি করে থাকে। আত্মা দেহ হতে বহির্গত হলে দেহ আর কর্মক্ষম থাকে না।

একাদশদ্বার বিশিষ্ট দেহপুর বা নগর আত্মশূন্য রূপে কিছুক্ষণ অবস্থিত থাকে মাত্র তারপর নষ্ট হয়ে যায়। সেই আত্মা দেহপুর পরিত্যাগের পর আবার স্ব স্ব বাসনা-কামনা অনুসারে কোন কোন আত্মা লোকো-ত্তরের দিকে অভিগমন করে আবার কোন কোন আত্মা দেহ ধারণের জন্য শুক্র-শোণিত সংযোগে জীবরূপে জাত হয়, কেহ বা কর্মানুসারে বৃক্ষ স্থাবরাদিও প্রাপ্ত হয়।[১]

সৃষ্ট জীব সুপ্ত বা নিদ্রিত হলে অন্তরে যিনি জাগ্রত থাকেন অর্থাৎ দেহপুরকে পাহাড়া দেন তিনি শুদ্ধ, ব্রহ্ম, অমৃত। যিনি এই ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয়, তিনিই হলেন আত্মা।[২]

তিনি অগ্নিরূপে জগতে জীবে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়ে অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হচ্ছেন, বায়ুরূপে জীবজগতের প্রাণরূপে প্রবিষ্ট হয়ে অন্তরে বাহিরে প্রতিরূপে বিকশিত হচ্ছেন।[৩]

১। কঠোপনিষৎ ২।২।৭
২। ঐ ২।২।৮
৩। ঐ ২।২।৯

এক সূর্য যেমন বহু জনের চক্ষুকে দৃষ্টিগোচর হয়েও বহু নয় এক, অশুচি বস্তুর দোষে লিপ্ত হয়েও নিজে কোনপ্রকার দোষে দূষিত হয় না সেইরূপ আত্মা বহু জনের হৃদয়ে বহু হয়েও এক, অশুদ্ধ আধারে থেকেও শুদ্ধ পবিত্র, দুঃখভোগেও চিরসুখময়,—স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত। সেই আত্মার এত শক্তি ও দীপ্তির প্রাখর্য যে এই সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। এরা সকলেই সেই বিরাট শক্তিমানের স্বল্পই প্রকাশ যন্ত্র মাত্র। তাঁর শক্তি ও দীপ্তিতে এরা দীপ্তিমান, প্রকাশমান, বিকাশমান। যা যন্ত্র তার কোন শক্তি নাই যন্ত্রীরই শক্তি। তেমনি জীব হৃদয়ে যে আত্মা অবস্থিত তাকে চক্ষু কর্ণ বাক্ মন কিভাবে দর্শন শ্রবণ, উচ্চারণ চিন্তন করবে? বরং আত্মার শক্তিতেই এরা পরিচালিত।[১]

প্রশ্নোপনিষদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মূলতঃ ঐ উপনিষদে প্রাণকে আত্মারূপে দেখা হয়েছে।

কৌসল্য পিপ্পলাদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—প্রাণের জন্ম কোথা হতে? শরীরে কিভাবে তা প্রবিষ্ট হয়? কি ভাবে স্বরূপচ্যুত হয়ে জীবরূপে অবস্থান করে? কিপ্রকার উপায় অবলম্বনে দেহ হতে বহির্গত হয়? কি প্রকারে দেহ ও বিষয়কে ধারণ করে?[২]

পিপ্পলাদ ঋষি বললেন—আত্মা হতেই প্রাণের জন্ম। কায়া এবং তার ছায়া ভিন্ন ও অভিন্ন, দুই হলেও এক। কায়ারই ছায়া হয়। ছায়া কায়াতে মিশে যায়। আত্মার আশ্রয়ে প্রাণের স্ফুরণ বা প্রাণ সত্তার বিকাশ হয়ে থাকে। মন সংকল্প দ্বারাই শরীরে অনুপ্রবেশ করে সেই আত্মা।[৩]

১। প্রশ্নোপনিষৎ ৩।১

২। ঐ ২।২।১৫

৩। ঐ ৩।৩

রাজা যেমন রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন তেমনি আত্মাও দেহরাজ্যে অবস্থিত হয়ে দেহধারণের উপযুক্ত আধার ইন্দ্রিয়গুলিকে যথা যথ স্থানে নিয়োগপূর্বক কার্য সম্পাদন করেন। আমরা আগেও পঞ্চপ্রাণের কার্যাবলী বর্ণনা করে এসেছি। মোটকথা আত্মারূপী প্রাণের অনুশাসনে ইন্দ্রিয়গণের কার্য হয়।[১]

তারপর বলছেন—আত্মার বাসস্থান হল হৃদয়াকাশ। এই হৃদয়াকাশে একশত একটি নাড়ী রয়েছে। এই সকল নাড়ীর এক একটিতে আবার একশত একটি করে প্রশাখা নাড়ী বিদ্যমান। সব মিলিয়ে বাহাত্তর হাজার প্রশাখা নাড়ী। ব্যানবায়ু এই সকল নাড়ীতে বিচরণ করে।[২] ব্যানবায়ুর অবস্থিত স্থান হল সন্ধিস্থানে, স্কন্ধস্থানে, মর্মস্থানে। এই স্থানগুলিতে ব্যানবায়ু শরীরের রক্ত সঞ্চালন, শক্তি সঞ্চালন, ওজঃ সঞ্চালন রূপকার্য সম্পাদন করে থাকে। এই সমস্ত নাড়ীদ্বারা দেহ বিধারণরূপ কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। এই সমস্ত নাড়ীগুলির মধ্যে আবার তিনটি নাড়ী প্রধান। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সন্ধি স্থলে এই নাড়ী ত্রয়ের নির্দিষ্ট নিয়মে সংযোজন ঘটেছে। সংযোজন ক্ষেত্র গুলিই হল মূলাধার (Pelvic Plexus) স্বাধিষ্ঠান (Hypogastric বা Vital Plexus) মণিপুর (Solar Plexus), ব্রহ্মগ্রন্থি (Cardiac Plexus), বিষ্ণুগ্রন্থি (Cervical Plexus), আজ্ঞাগ্রন্থি (Plexus of the Command or Pituitary gland) এই সমস্ত গ্রন্থিগুলির কার্যাবলীর বিবরণ এ স্থানে দেওয়া গেল না। কারণ আত্মতত্ত্বই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১। প্রশ্নোপনিষৎ ৩।৪

২। ঐ ৩।৭

সমস্ত নাড়ীগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আবার তিনটির মধ্যে সুষুম্নানাড়ী সর্বপ্রধান। জীবের প্রাণবায়ু দেহ হতে বাহির হওয়ার সময় বিভিন্ন নাড়ীকে অবলম্বন করে নির্গত হতে পারে। কিন্তু একমাত্র উর্ধগতি লাভ করতে হলে বা উর্ধগতি লাভের পথ হল সুষুম্না পথ।

ঋষি বলছেন – উদানবায়ু, পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যলোকে, পাপকর্মের ফলে পাপলোকে এবং পাপ-পুণ্য উভয় বর্তমান থাকলে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পুণ্যকর্মে স্বর্গলোকে, পাপকর্মে নরকে এবং পাপপুণ্য সমভাবাপন্ন ব্যক্তিকে পৃথিবীলোকে অবস্থান করতে হয়।[১]

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, যা দেহ ভাণ্ডে তাই ব্রহ্মাণ্ডে। দেহের যন্ত্র-তন্ত্র-উপাদান প্রভৃতি যে ভাবে অবস্থিত ও সংগঠিত, সেই ভাবেই আবার বিরাট পুরুষের দেহ গঠিত। একটি হল ব্যাষ্টিরূপ আরেকটি হল সমষ্টিরূপ। সেই হিসাবে এই মহাকাশই ব্রহ্মপুর আর জীবের হৃদয়ে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ তাই হৃদয়াকাশ। শিশিক্ষু শিষ্যগণ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছেন – এই ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহরূপ ক্ষুদ্রাকাশ ইহার মধ্যে এমনি কি আছে? আচার্য বললেন—বাইরে এই আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অভ্যন্তরের আকাশও সেই পরিমাণ। স্বর্গলোক ও পৃথিবী এই উভয়ই দেহপুরে অবস্থিত। অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ—এই সমস্ত অবস্থিত।[২] শিষ্যগণ প্রশ্ন করলেন—এই দেহপুরে যদি সর্বভূত ও সর্বকামনা নিহিত থাকে, তাহলে দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তখন কি অবশিষ্ট থাকে? আচার্য বললেন—দেহ জরাগ্রস্থ হলেও হৃদয়াকাশ জরাগ্রস্থ হয় না। দেহ ধ্বংস হলে ইহা ধ্বংস হয় না। ইহা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। এই পুরে সমস্ত কামনা নিহিত থাকে। ইনি আত্মা—ইনি

১। প্রশ্নোপনিষৎ—৩।৭

২। ছান্দোগ্য—৮।১।৪

পাপ পরিশূন্য, জরাব্যাধি পরিশূন্য, মৃত্যুশোক ক্ষুধা রহিত, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প। এই পৃথিবীতে প্রজাগণ রাজার আদেশে কর্ম করে। সেইরূপ রাজার আদেশে প্রজাদের কাম্যবস্তু লাভ হয়।[১]

কাম্যবস্তুর একদিন না একদিন বিনাশ হয়। তেমনি সে ব্যক্তি ইহলোকে আত্মাকে না জেনে পরলোকে গমন করে সে পরলোকেও পরাধীন। আর যে ব্যক্তি আত্মাকে জেনে ইহলোক ত্যাগ করে সে পরলোকেও স্বাধীন। এই জগতে কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পরলোকেও কামনার নিবৃত্তি হয় না।

কামনা কিনা বৃত্তি। এই বৃত্তির দুই দিক বা দুই প্রকারের। একটি জৈবিক আরেকটি আত্মিক। জৈবিকবৃত্তিগুলি আপাত সুখের কারণ কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ক আর আত্মিকবৃত্তি আপাত দুঃখকর কিন্তু পরিণামে চিরশান্তিদায়ক। তাই মানুষ তার বিবেকের অনুশাসনে চলে ইহজগতেই আত্মিক কামনা আত্মিকবৃত্তির অনুশীলন শক্তি অর্জন করে নিতে পারলে কি ইহলোকে কি পরলোকে পার্থিব্য কামনার আশ্রয় পরাধীন জীবন যাপন করতে হয় না। সে জন্য আত্মজ্ঞানীর কামনা পূরণ সঙ্কল্প মাত্রই হয়ে থাকে।

পিতৃলোকই স্বর্গলোক। স্বর্গলোকে স্বর্গভোগ। এক এক লোকে জীবের এক এক প্রকারের কর্মফল ভোগ হয়। জ্ঞানীব্যক্তি পিতৃলোক, মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক প্রভৃতি লোকের ভোগ কামনা মাত্রই পিতৃগণ মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ তার নিকট উপস্থিত হয়ে ভোগফল দান করান।[২] জ্ঞানীব্যক্তি প্রকৃত আত্মরহস্য অবগত হওয়ার জন্য জাগতিক, পার্থিব্য সুখ তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, আকৃষ্ট করতে পারে না। জ্ঞানীব্যক্তি সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা মন ও প্রাণকে অবলম্বন করে দেহ,

১। ছান্দোগ্য—৮।১।১—৮।৩।৫

২। ঐ ৮।১।৫

দেহাতীতে, ভূতে ভূতে লোকে লোকে আত্মার পারমার্থিক সত্তাকে দর্শন করে অভয় ও অমৃত হন।

এই পারমার্থিক সত্তার জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথম নিজ দেহস্থ প্রাণশক্তির মাধ্যম দিয়ে বিশ্বপ্রাণসত্তায় পৌঁছাতে হয় যোগীকে। আমরা আগেও বলেছি দেহ মধ্যে যে প্রাণের ক্রিয়া চলছে বিশ্বজগতেও বিরাট-ভাবে সমষ্টি ভাবে সেই প্রাণশক্তির খেলাই ক্রিয়াশীলা। প্রাণশক্তি কিনা আত্মশক্তি। দেহস্থ প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা দর্শন, শ্রবণ কথন প্রভৃতি বহিঃপ্রাণ শক্তির সঙ্গে সংযোজিত হয়ে থাকে। যেমন সূর্য বাহ্যপ্রাণ। চক্ষুতে সেই সূর্যেরই অবস্থিতির জন্য প্রাণবায়ুকে অবলম্বন করে চক্ষুর আলোক রশ্মির বিকিরণ হয়। বিশ্বপ্রাণ ও দেহস্থ-প্রাণ সমধর্মী বলে উভয়েরই ধর্ম প্রকাশত্মক।

তারপর ভূলোকের প্রাণদেবতা অগ্নি আর দেহস্থ নাভি ও গুহ্য-প্রদেশের মধ্যে যে অপানবায়ু ক্রিয়াশীলা তা দুইই সমধর্মী। মহাপ্রাণ ভূপৃষ্ঠের দিকে বস্তুকে আকর্ষণ করে, শরীরস্থ অপানবায়ু মলমূত্রকে নিম্নদিকে নির্গত করাবার সাহায্য করে। এখানে আমরা দেখছি নাভি হতে উর্ধদিকে প্রাণবায়ুর কাজ আর নাভি হতে গুহ্য পর্যন্ত অপান বায়ুর কাজ। আকাশস্থ প্রাণ নিম্নপ্রদেশস্থ বায়ু অপান উহার মধ্যস্থলে সমানবায়ু বিদ্যমান উহাও প্রাণ। ইহা প্রাণ ও অপানকে মূহুর্মুহু সংযোজন করে বলে এই বায়ুর নাম সমানবায়ু। উদরের রসাদি বাহাত্তর হাজার নাড়ী মধ্যে পরিব্যপ্ত করা, দেহকে পরিপুষ্ট করা, স্বেদ নির্গত করা সমানবায়ুর কাজ। প্রাণবায়ু যেমন হৃদেশে, অপানবায়ু যেমন গুহ্যদেশে সমানবায়ু তেমনি নাভিতে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে, ব্যান-বায়ু সর্বশরীর ব্যাপী অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে প্রাণই মূল। প্রাণবায়ুর কর্মভেদে বিভিন্ন স্থানে তার অবস্থিতির জন্য বিভিন্ন নামাকরণ হয়েছে।

যাইহোক আমাদের আলোচ্য হল বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে দেহস্থ প্রাণের

সম্বন্ধ। বিশ্বপ্রাণের প্রাণবায়ু দেহস্থপ্রাণের সঙ্গে সংযোজিত, বিশ্বপ্রাণের অপানবায়ু দেহস্থ অপানবায়ুর সঙ্গে সংযোজিত, এইভাবে সমান, উদান, ব্যান প্রভৃতি বায়ুও। এই সংযোজন বিচ্ছিন্ন হলেই দেহের মৃত্যু। দেহস্থ প্রাণবায়ু নাসিকাদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়ে যদি পুনরায় দেহে প্রবিষ্ট না হয় তবে দেহের মৃত্যু।

শরীরের মধ্যে উদানবায়ুর অনুগ্রহশক্তির হ্রাস হলে জীবের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হতে থাকে তখন মুমূর্ষু জীব দেহত্যাগের পর মনোমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এখানে বুঝতে পারা যাচ্ছে উদান বায়ুর কাজ হল দেহে উত্তাপ সঞ্চার করা। দেহস্থ তাপের হ্রাসেই জীবের মৃত্যু হয় কিন্তু মৃত্যুর সময় দেহ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি মনে অনুবর্তন করে। মনকে অবলম্বন করে অন্যদেহে গমন করে।[১] এ প্রসঙ্গে অন্য শ্রুতি বলছেন—'ইন্দ্রিয়সমূহ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ দেহস্থ তেজে, তেজ পরমদেবতায় লীন হয়।' এই ক্রমে পুরুষের পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে তবেই বিধেয় নচেৎ নয়। যিনি যে পর্যন্ত জ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েছেন তিনি সেই পর্যন্ত চিত্তকে নিয়ে যেতে পারবেন মাত্র। চিত্তকে পর পর তত্ত্বে লীন করে জ্ঞানীকে পরমপদে অবস্থান করতে হয়। জ্ঞানবান পুরুষে ইহা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে যায়। অজ্ঞানীর পক্ষে তা হয় না। অজ্ঞানী তা পারে না বলেই বারবার জন্ম মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গমনই হল দেহস্থ আত্মার নির্গমন। প্রাণতত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। অন্তরে বাহিরে, বিশ্বে ও বিশ্বাতীতে এই আত্মা যুগপৎ অবস্থিত। ইহজীবনেই সেই জ্ঞান সাধনাদ্বারা লাভ করলে তবেই আত্মতত্ত্বরূপ অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

দেহ হতে প্রাণবায়ুর নির্গমন পথ শরীরের বিভিন্ন নাড়ীর মধ্য দিয়ে

১। প্রশ্নোপনিষৎ—৩.৯

হতে পারে। এবং সেই মত গতি পথ নির্ধারিত হয়ে যায়। গতিপথ অর্থে দেহ হতে প্রাণ বহির্গত হয়ে মহাপ্রাণের কোন স্তরে অবস্থিতি। পঞ্চভূত দিয়ে বিশ্বসৃষ্টি যেমন তেমনি দেহও সৃষ্ট। দেহের মধ্যে এই পঞ্চতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ স্থানে তার গুণ প্রকাশ আছে। মূলাধার ক্ষিতিপ্রধান, স্বাধিষ্ঠান অপ্‌প্রধান মণিপুর তেজপ্রধান, অনাহত বায়ুপ্রধান বিশুদ্ধ আকাশ প্রধান। এই পঞ্চভূতের গুণও ভিন্ন ভিন্ন। এই পঞ্চভূত দ্বারা পাঁচটি কোষ ও পাঁচটি কোষ দ্বারা একটি ব্যক্তির তিনটি দেহ তৈরী হয়। এই হল ব্যষ্টিদেহের সংক্ষিপ্ত আত্ম পরিচয়।

এখন গতির কথায় আসা যাক্। ব্যষ্টি চেতনা কিভাবে বিশ্বচেতনায় স্থান লাভ করবে? ভূলোক ক্ষিতিতত্ত্বে রচিত বলে জীবদেহে ক্ষিতির ভাগ বেশী। ভুবর্লোক অপতত্ত্বে রচিত বলে ভুবর্লোক বাসীর জীবদেহ অপ্‌প্রধান। স্বর্লোক তেজতত্ত্বে রচিত বলে স্বর্লোকবাসীদের দেহ তৈজসময়। মহর্লোক বায়ুতত্ত্বে রচিত বলে সেখানের জীবদেহ বায়ু প্রধান। ব্রহ্মলোক আকাশতত্ত্বে রচিত বলে সেখানকার অধিবাসীর আকাশ শরীর। ব্রহ্মলোকের তিনটি স্তর জন, তপ, সত্য এই পাঁচটি লোক পঞ্চভূতের এক এক ভূতের আধিক্যে সৃষ্ট। এই লোকগুলির এক একটি কোষের প্রাধান্য। যেমন ভূলোকবাসীর অন্নময় কোষ, ভুবর্লোকবাসীর প্রাণময় কোষ, স্বর্লোকবাসীর মনোময় কোষ, মহর্লোকবাসীর বিজ্ঞানময় কোষ, ব্রহ্মলোকবাসীর আনন্দময় কোষ। ইহা ছাড়া আরো লোক আছে সেগুলি এখানে আলোচনা করা গেল না। এই সমস্ত লোকের জীবদেহের ধাতুগত পার্থক্য অনেক। ভূমি অনুযায়ী দেহের উপাদান ও গঠন। যেমন ভূমিতে বিচরণের স্থল যান। জলে বিচরণের যান জলযান আবার আকাশে বিচরণের ব্যোমযান তেমনি সূক্ষ্মজগতের বিচরণের জন্য বিভিন্ন কোষময় দেহ। কোথাও অন্নময় Physical body, কোথাও প্রাণময়দেহ Ether-body প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন ধাতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও

আত্মরাজ্য—। দেহের পূর্ণতা সমস্তগুলি নিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডেও সম্যকরূপ ভিন্ন ভিন্ন অণ্ড ধরে। তাই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি অণ্ডের অংশ নিয়ে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড। তেমনি আমরা পূর্বেই বলেছি সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে যতকিছু অবস্থিত, ব্যষ্টি জীবদেহ ভাণ্ডে তারই অংশ। তাই আমাদের দেহও ঐ পঞ্চকোষের সমষ্টি। পঞ্চকোষদ্বারা আত্মা আবরিত। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আত্মার বিভিন্ন পরিণামই বিভিন্ন ভূত সমষ্টি। সেজন্য ঋষি বলছেন—"আত্মা-শব্দ-বাচ্য ব্রহ্মহতে আকাশ, আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল, জল হতে পৃথিবী, পৃথিবী হতে ওষধি, ওষধি হতে অন্ন, অন্ন হতে দেহধারী পুরুষ। এই পুরুষ অন্নেরই বিকার। এই পুরুষ পক্ষিসদৃশ। স্কন্ধ উপরি মস্তক, বাম ও দক্ষিণ হস্ত দুটি পাখা, মধ্যে দেহ, নাভির নিম্ন হল পুচ্ছ।"[১]

মহান্ আত্মা হতে পঞ্চভূতের মধ্য দিয়ে অন্নের সৃষ্টি, এই অন্ন জীব ভক্ষণ করে রসরক্তাদি ক্রমে শুক্র হতে জীবদেহ সৃষ্টি হচ্ছে। জীবদেহ ধ্বংস হতে পঞ্চভূতাদি ক্রমে পুনরায় ব্রীহিযবাদি ক্রমে অন্নরূপে জীবের পুনরাগমন হয়। "সেই (আত্মা) এই অন্নরসময় দেহ হতে ভিন্ন, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তারই অভ্যন্তরে স্থিত আর একটি দেহ (কোষ) আছে। এই দেহটির নাম প্রাণময় দেহ। এই প্রাণময় দেহটিও অন্নময় দেহের মত পুরুষাকার; দেখিতে পক্ষীর ন্যায়।

প্রাণ বায়ুই এই পক্ষীর (প্রাণময় দেহের) মস্তকস্বরূপ। প্রাণ বায়ুই দেহস্থ সকল বায়ু মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণে প্রাণ বায়ুকে পক্ষীর মস্তক বলা হয়েছে।

ব্যান ও উদান বায়ু উক্ত পক্ষীর দুটি পাখা। ব্যানবায়ু দেহের সর্বত্র চলাচল করে এবং উহাই জীবের গতি শক্তির হেতু। উদানবায়ুর গতি উর্ধাভিমুখী পাখীও পাখাদ্বারা সর্বত্র চলাচল করে এবং পাখা

১। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।৩

দ্বারাই উর্ধদিকে উত্থিত হয়। এইকারণে ব্যান ও উদান বায়ুকে দু'টি পাখা বলা হইয়াছে।

আকাশ আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ)—আকাশ এস্থলে সমান বায়ুর জ্ঞাপক। সমানবায়ু দেহের মধ্যভাগে নাভিমূলে অবস্থিত; এই কারণে সমানবায়ুকে পক্ষীরূপে কল্পিত পুরুষের দেহ-মধ্যভাগ বলা হয়েছে। দেহমধ্যস্থ বলে ইহা আত্মা নামে কথিত। কারণ আত্মাই অঙ্গসমূহের মধ্যস্থ বলে প্রসিদ্ধ।

পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা – পৃথিবী এস্থলে অপান বায়ুর জ্ঞাপক। পৃথিবীদেবতা প্রাণ-স্থিতির কারণ বলে আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারয়িতা, অন্যথা উদানবৃত্তি শরীরকে উপরে নিয়ে যেত। অথবা গুরুত্ব হেতু উহা নিচে পড়ে যেত। এই কারণে পৃথিবী দেবতাকে প্রাণময় আত্মার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে।[১]

প্রাণশক্তিতেই সকলে কর্মক্ষম হয়। প্রাণই আয়ু বা প্রতিষ্ঠা। প্রাণ দেহ হতে উৎক্রান্ত হলে দেহস্থভূত সমূহও বিভক্ত হয়ে পড়ে। অন্নময়ের অধিষ্ঠিত প্রাণময় আত্মা, প্রাণময়ের অধিষ্ঠিত মনোময় আত্মা। এই আত্মা পুরুষাকার। মনোময় হয়ে স্বতন্ত্র কিন্তু তার অন্তঃস্থলে একটি আত্মা অবস্থিত তার নাম বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকৃতি।

"বিজ্ঞান শব্দের অর্থ নির্মল বুদ্ধি, যাহাদ্বারা সত্যের অনুভূতি হয়। এই বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। আমাদের মন সর্বদাই সংকল্প-বিকল্পাত্মক কিন্তু মনের ক্রিয়া সংশয়াত্মিক বলে উহা কিছুই স্থির নিশ্চয় করতে পারে না। মনের সংকল্প-বিকল্প বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হলে বুদ্ধি একটি নিশ্চয় করে দেয় এবং সেই অনুসারে কর্ম হয়ে থাকে। কাজেই বুদ্ধি-বিজ্ঞানই কর্মের প্রবর্তক। এজন্য বলা হচ্ছে বিজ্ঞান কর্ম বিস্তার করে।

১। উপনিষৎ নবক—অতুলচন্দ্র সেন পৃষ্ঠা ৪২৭

২। ঐ পৃষ্ঠা—৪৩৫

যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নির্মল আস্তিক্যবুদ্ধি বা শ্রদ্ধার দরকার। এই শ্রদ্ধা নির্মল-বুদ্ধি বিজ্ঞান হতে আসে। সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম হতে ক্রমশঃ স্থূলে, উচ্চতত্ত্ব হতে ক্রমশঃ নিম্নতত্ত্বে ব্রহ্মের প্রকাশ হয়ে থাকে। বুদ্ধি বিজ্ঞান দেহ, মন, প্রাণ হতে সূক্ষ্ম এবং উচ্চতর তত্ত্ব; কাজেই বুদ্ধি-বিজ্ঞান ইহাদের পূর্বে প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে ইহাকে প্রথমজ বলা হয়েছে। এই বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মই মহান আত্মা নামে অভিহিত। ইহাই সত্য, ঋত এবং বৃহৎ। ইহাকে হিরণ্যগর্ভও বলা হয়। দেবতাগণ দেহ, মন, প্রাণে আত্মা ভাবনা না করে এই মহান আত্মার উপাসনা করেন।" "বিজ্ঞানময় হতে ভিন্ন অথচ ইহার অন্তর্বর্তী আনন্দ আত্মা আছেন যাদ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দ-ময়ও বিজ্ঞানময়ের মত পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট এবং পক্ষীরূপে কল্পিত।

প্রিয় এই পক্ষীরূপী আনন্দময়ের মস্তক। এখানে প্রিয় অর্থ প্রিয়জন সম্মেলনজনিত সুখ। যাকে ভালবাসা যায় তাহার সহিত মিলনে যে সুখ অনুভব হয়, তা উৎকৃষ্ট সুখ বলে উহাকে আনন্দময়ের মস্তক বলা হয়েছে। অভীষ্ঠ বস্তু, যেমন ধন-রত্নাদি পেলে যে হর্ষ জন্মে তা মোদ; হর্ষের প্রাচুর্যই প্রমোদ। এই রকম হর্ষের দ্বারাই সুখের বিস্তার হয় বলে ইহাদিগকে পাখা বলা হয়েছে। বিভিন্ন হর্ষের মধ্যে যে সাধারণ সুখানুভূতি বর্তমান তাই আনন্দ। এই আনন্দ সমস্ত সুখের আত্মাস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত সুখানুভূতির প্রতিষ্ঠা, কারণ এক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টিতে নানা সুখানুভূতির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে এই সুখানুভূতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। নিম্নস্তরে ইহা অতি স্থূল ও মলিন, উচ্চস্তরে উহা সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ। বিদ্যা, তপস্যা, শ্রদ্ধাদ্বারা নির্মলচিত্তে, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন অন্তঃকরণে এই আনন্দ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়।[১]

১। অতুলচন্দ্র সেন প্রণীত উপনিষৎ নবক পৃষ্ঠা ৪৩৮

এই ভাবে হয় আত্মার বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ। এই যে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ ইহা কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নয় ইহা তার অভিনয় মাত্র। যেমন প্রভাত নামক ব্যক্তি বিভিন্ন অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে কোথাও রাম কোথাও শ্যাম কোথাও ইন্দ্র কোথাও অর্জুন প্রভৃতি অভিনয় করে দর্শনকে মুগ্ধ করে কিন্তু অভিনয়ের রাম শ্যাম প্রকৃত উহা নহে উহার প্রকৃত নাম প্রভাত। তেমনি আত্মার বিভিন্ন অবস্থাগুলি আত্মা নহে তবে বলা যায় আত্মার অন্নময় অবস্থা, আত্মার প্রাণময় অবস্থা, আত্মার আনন্দময় অবস্থা কিন্তু প্রকৃত আত্মার অবস্থা হল—হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

এই পঞ্চ অবস্থার এক একটি অবস্থার ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণী বিদ্যমান আছে। আত্মময় কোষ বিশিষ্ট যিনি তিনি নিত্য চৈতন্যযুক্ত। বিজ্ঞানময় দেহধারী হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। মনোময় দেহধারী জীব ইন্দ্র বরুণ, প্রাণময় দেহধারী আত্মাগণ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, ভূত, প্রেত ও বেতালাদি, আর অন্নময় স্বরূপের আত্মা এই স্থূল মানবাদির।

তাহলে এই কোষগুলি হল ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের আত্মার বাস-উপযোগী গৃহ বা পুর। কোষগুলি আত্মার স্বরূপ নহে, বাসগৃহ। একটি কোষ হতে অপর কোষের আয়তন বা পরিসর অধিক। অন্নময় কোষ হতে প্রাণময়কোষের আয়তন অধিক, প্রাণময় হতে মনোময় কোষের আয়তন অধিক। এইভাবে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আত্মা বৃহৎ স্বরূপ হতে অনুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। তিনি সবই হয়েছে এই তার অমিত বীর্য আবার এত কিছু হয়েও তিনি কিছুই হননি এই তার তত্ত্বরহস্য।

সাংখ্যকার সেজন্য বলছেন—সেই পুরুষ বা প্রকৃতি হতে চব্বিশ-তত্ত্বের মধ্যদিয়ে ভূতাত্মক জীব সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চভূতের শেষ পরিণাম জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর এগুলির জড়াত্মক বলে একটি স্থূলরূপে খণ্ডিত। কিন্তু মৃত্তিকা হতে জল আরো একটু ব্যাপ্ত। কারণ জলপাত্র ভেঙ্গে

গেলে ছড়িয়ে পরে, জল হতে আবার আগুন আরো ব্যাপ্ত, তার থেকে বায়ু, তার থেকে আকাশ। এখানে দেখা যাচ্ছে একভূত হতে অপর ভূতটি ব্যাপ্ত। তেমনি একটি কোষ হতে অপর কোষের ব্যাপ্তবোধ বেশী। তাহলে আত্মা সর্বব্যাপ্ত। তার রূপস্তর ও অরূপস্তর দুটি দিক। তৃতীয় খণ্ডে এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। স্বপ্নজগৎ ও অন্তর্জগৎ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আত্মার গতিবিধি

স্থূলদেহ নিয়ে মানুষ বা জীবমাত্রই বিভিন্ন স্থানে গতাগতি করে। এই গতাগতির মূলে থাকে এক শক্তি, দেহ ক্রিয়াপরমাত্র। তেমনি সূক্ষ্মদেহের গতাগতি আছে—তারও শক্তি আছে, বল আছে। মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেহ হতে বহির্গত হ'লে প্রথমে ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে পৌঁছায়। পরে মহর্লোকে গিয়ে ভোগদেহ অভাবে পুনরায় নিম্নদিকে অবতরণ করতে থাকে এবং মেঘ, বৃষ্টি, শস্য প্রভৃতির মাধ্যম দিয়ে জীবরূপে জন্ম নিতে বাধ্য হয়। এ হ'ল এক ধরণের জীবাত্মা অবতরণ গতি। কিন্তু তাছাড়া যে সমস্ত আত্মা একটু উন্নত ধরণের অর্থাৎ কামনা-বাসনা যাঁদের চিত্তে নাই, ভগবানে ভক্তি পরায়ণ অথচ সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় নাই তাঁরা প্রথমে মহর্লোকে গিয়ে জন, তপঃ, সত্যলোকে অবস্থান করেন এবং মহাপ্রলয়ে তাঁদের মুক্তি হয়। এই ধরণের আত্মার গতিকে ক্রমমুক্তি বলে। চতুর্বিধ মুক্তির কথা যা আগে বলা হয়েছে তা হ'ল জীবাত্মার বিভিন্ন গতি।

কিন্তু জীবাত্মার সর্বশেষ গতি হ'ল নির্বাণ। নির্বাণ মানে স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। অদ্বৈতবাদীগণের মতে 'নির্বাণস্তু মনোলয়ঃ'। এই নির্বাণ মুক্তিই হ'ল জীবের চরম ও পরম গতি। যতদিন জীব সেই চরম স্থানে পৌঁছাতে না পারছে ততদিন জীবাত্মার বিভিন্ন লোকে গতি ও স্থিতি অবশ্যম্ভাবী।

জীবাত্মার গতি কর্মফল অনুযায়ী হয় এ কথা আগেও বলা হয়েছে। কর্মফল সুখ দুঃখ দুই-ই হতে পারে। মরণের পর স্বর্গনরক ভোগ হয় জীবনের কর্মফলানুযায়ী। পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'পরলোক' গ্রন্থে লিখেছেন—'তবে মরতে মরতেই স্বর্গে যায় এমন লোকও আছে। তাদের সংখ্যা খুব কম। জীব মরণের পর পৃথিবীর মায়া কাটাতে থাকে, ক্রমে আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পায়।

ভুবর্লোকে যতদিন থাকে, ততদিন কেবল ঐ চেষ্টাই করে, তখন অনুক্ষণই পৃথিবী হইতে স্নেহ, ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, চিন্তা সবই গুটাইতে থাকে। যখন, সেখানে সমস্ত বৃত্তিটা চূড়ান্তভাবে গুটানো হয় তখন জীব ভুবর্লোকেও আর থাকে না। তখন স্বর্লোকে চলিয়া যায়। ভুবর্লোকেও যেন তখন তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু সে মৃত্যুতে যাতনার লেশ নাই। সে মরণের কথা পার্থিব দেহীরা ধারণাও করিতে পারেন না। সে একটা সুখের মরণ। স্বর্লোকে গেলে ভুবর্লোকে একদেহ পড়িয়া থাকে। সেটা বাসনা দেহ। তাকে কখনও কখনও আতিবাহিক দেহও বলে। জীব স্বর্লোকে যাইয়া দেখে সেখানে জীবের সুযোগ-সুবিধা সুখ-স্বাচ্ছন্দ আরও বেশী। ভুবর্লোক হইতে স্বর্লোকে যাইবার সময় একটা সুখের তন্দ্রায় জীব যেন ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার পর ঘুম ভাঙ্গিলেই দেখে সে স্বর্গে, একটা মহা আনন্দ রাজ্যে যাইয়া উঠিয়াছে।'

সূক্ষ্মদেহের যে উৎভ্রান্তি হয় তার ভ্রম এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন—দেবযান ও পিতৃযাণ পথ, জায়স্ব ম্রিয়স্ব পথ এবং এই সমস্ত পথে যাওয়ার যে অবলম্বন তাও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণ প্রভৃতির মাধ্যম দিয়ে চন্দ্রলোকে স্থিতি লাভ করে জীবাত্মা আবার অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতির মাধ্যম দিয়ে ব্রহ্মলোকে স্থিতি লাভ করতে পারে জীবাত্মা। জীবাত্মার ভাব ও পরিণতির উপর নির্ভর করে গতিপথ। এখানে পতিপথ বলতে দেহ হতে বহির্গমন এবং দেহে অনুপ্রবেশ দুই-ইবোঝানো হচ্ছে। পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ দ্যুর্লোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ মধ্য দিয়ে জীবরূপী মানুষের দেহ সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত থাকে। আমি শুনব, দেখব এইরূপ একটা সঙ্কল্প ভ্রূণের মধ্যে থাকার জন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মায় ইন্দ্রিয়াদির গঠন হতে থাকে। স্থুলদেহের পরিণতিতে আবার সে গমন করে পরলোকাদিতে।

নিদ্রাকালে জীবাত্মা স্থূলদেহ সম্পর্ক ত্যাগ করে সূক্ষ্ম মনোময় দেহে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে যেমন, মৃত্যুর পরও স্থূলদেহ সম্পর্ক ত্যাগ করে মনোময় দেহে পরলোকে গতি হয় তেমনি গতির ক্রম বলতে গিয়ে শ্রুতি বলেছেন—'বাক অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষুরিন্দ্রিয় আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। তবে আদিত্যলোকে গতি হওয়ার মত, জ্ঞান জীবাত্মায় সঞ্চিত থাকা দরকার। মৃত্যুকালে ক্রমোত্তর বাসনা এবং ক্রমনিম্ন বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে গতিপথ ও লোকস্থিতি নির্ভর করবে।

দেহের মধ্যে এবং দেহ ব্যতীত দুই দিকেই আত্মার গতি সূক্ষ্ম। বিশেষতঃ দেহের মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করে ও ছয়টি চক্রকে অবলম্বন করে এর একটা গতি সদাই বর্তমান। গতি কিনা চিৎশক্তির ক্রমোত্তর এবং ক্রমনিম্ন প্রবাহ। বিভিন্ন চক্রে ইহার নাম ও কাজ ভিন্ন। মূলাধারে অগ্নি, মণিপুরে বৈশ্বানর, অনাহতে প্রাণ, আজ্ঞায় ভর্গ, সহস্রারে ব্রহ্ম। যোগশাস্ত্রে এই শক্তিকে বায়বী বলে অভিহিত করা হয়েছে—'সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।' সাধারণতঃ দেহমধ্যে এই শক্তি প্রসুপ্তভাবে অবস্থান করে কিন্তু ইহার দ্যুতিতে দেহযন্ত্র সচল হয়। ইহার গতি সুষুম্নার মধ্য দিয়ে। ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা যোগী পুরুষরা ঐ শক্তিকে চালনা করে থাকেন। মূলতঃ জীবাত্মার বা আত্মার গতি বলতে উহাকেই বোঝায়। বাকী যে সমস্ত পথে আত্মার গতি হয় তা' প্রক্ষিপ্ত গতি। সুষুম্নার গতি ব্রহ্মরন্ধ্রের সঙ্গে সংযুক্ত বলে স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ ভেদ হয়। আর ত্রিবিধদেহের বিনাশ হ'লে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হয়ে অভেদসত্তা প্রাপ্ত হয় তখন আর কোন গতি থাকে না, দ্বৈত-অস্তিত্ব থাকে না বলে স্বর্গ নরকভোগও থাকে না। জীবাত্মার শক্তি ও গতি বলতে স্বরূপ প্রাপ্তিকে বোঝায়। স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটার পথে বহু পর্যায়ক্রমে জীবাত্মার উত্তরণ ও অবতরণের প্রবাহের সৃষ্টি হয় মাত্র। আত্মচৈতন্যের ইহা বিভিন্ন দিক হলেও স্বরূপ প্রাপ্তিতেই সর্বগতির শেষ পর্যবসান ঘটে। ইহাকে মূলাধারের

চিৎশক্তি ও সহস্রারের পরম শিবের মিলন বলা হয়ে থাকে। শক্তির স্বাভাবিক গতি নিম্নমুখী যা জন্মান্তরের কারণ আর শক্তির গতি শিবাভিমুখী হলে কিনা পরমাত্মামুখী হলে অব্যক্ত অমৃতে জীবাত্মার বিলয় ঘটে গতির নিরোধ ঘটে।

দিব্য মিডিয়ম-বিজ্ঞান

মিডিয়ম একপ্রকার তন্দ্রাচ্ছন্ন-নিদ্রার মত অবস্থা। একে অনেকে যোগনিদ্রাও বলেন। জগতের মধ্যে জীবের মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে। সেই শক্তিকে মানুষ যদি আহরণ করতে পারে তাহলে সে মুহূর্ত মধ্যে যে কোন জীব প্রাণীকে বশীভূত করতে পারে। এই শক্তি সর্বত্রই বিদ্যমান কিন্তু তাঁর প্রকাশ বিকাশ সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন অগ্নি, জল প্রভৃতি বায়ু মণ্ডলের মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু সুপ্ত, তাই বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটাতে হয়। মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুতের আবির্ভাব দেখা যায়। বিদ্যুৎ বায়ুমণ্ডলেই অবস্থিত ছিল কিন্তু তাকে দর্শন করা যাচ্ছিল না। তেমনি প্রতি প্রাণীর মধ্যে আকর্ষণী শক্তি অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও বুঝা যায় না, কাজে লাগান যায় না। যাঁরা এই শক্তি আহরণ করবার চেষ্টা করেন তারা সেই শক্তি লাভ করেন এবং প্রয়োগ করে অলৌকিক বহু কর্ম করে মানুষকে মুগ্ধ করেন।

চুম্বকের যেমন আকর্ষণী ও বিকর্ষণী দুই শক্তি আছে তেমনি মানুষের মধ্যেও ঐ দুই শক্তিই নিহিত। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ দুই শক্তির নাম দিয়েছেন পজেটিভ আর নেগেটিভ।

এই শক্তি শব্দ বা নাদ হইতেই সৃষ্ট। নাদের ব্যক্তরূপ ও অব্যক্তরূপ আছে। নাদের স্পন্দনই শক্তি। মূলতঃ সৃষ্টির সমস্তই নাদাত্মক। নাদের ক্রিয়াই হল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। নাদ হতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন, রেত, পুরুষ সৃষ্ট।[১] স্পন্দনাত্মক ধ্বনি বা নাদই জগৎব্যাপি ব্যাপ্ত। নাদের স্থূল পরিণাম জগৎ বা দেহ আর সূক্ষ্ম পরিণাম জ্যোতি। সেজন্য জীব জন্ম গ্রহণ

১। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

করেই ক্রন্দন দ্বারা নাদই প্রকাশ করে। এই পরিণাম হতে জীবকে পুনরায় মহানাদাত্মক ভূমিতে ফিরে যেতে হলে যোগাভ্যাসরূপ মানসিক তপস্যা প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা সে নাদকেই প্রাপ্ত হয়। ধীরে ধীরে নাদ বিন্দু কলা জ্যোতিতে সহবস্থিত হয়। জ্যোতিই পরমাত্মা। উহাই জীবের স্বরূপ।

জীবাত্মার তড়িৎ তরঙ্গের সঙ্গে পরমাত্মার তড়িৎ তরঙ্গের সংযোগ স্থাপন যোগের মূল লক্ষ্য। পরমেশ্বরের স্পন্দনাত্মক মহাকর্ষণ-তরঙ্গ নাদরূপ চুম্বক তড়িৎ তরঙ্গ মাধ্যমে জীব ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মা' শব্দ উচ্চারণ পূর্বক বায়ুকে গ্রহণ করে ও শব্দ উচ্চারণ পূর্বক হৃদয়ে বায়ু শূন্য করে। স্পন্দনাত্মকজীব বায়ুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ সচেতন করে কর্ম করে। মূলতঃ পিতামাতার স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া হতেই জীবের জন্ম হচ্ছে। বাইরের তড়িৎ শক্তিকে আকর্ষণ করিবার শক্তি যখন জীব হারায় তখন স্পন্দনাত্মা জীব শবদেহে পরিণত হয়।

মানুষের মধ্যেও তড়িৎ বিদ্যমান আছে এবং এই তড়িৎকে যদি কেউ সাধনা দ্বারা জাগাতে পারে বা বিকাশ ঘটাতে পারে তাহলে সে নানা অনুভূতি লাভ করতে পারে। তাছাড়া দেহের যে বিভিন্ন অবয়ব তার প্রাণশক্তিই হল ঐ দেহস্থ নাদাত্মক-তড়িৎ। এই তড়িৎ আত্মাতেই রয়েছে। তড়িৎকে ধরে রাখতে না পারার জন্যই নানা ব্যধিগ্রস্থ হতে হয়, দেহ অকর্ম হয়ে পড়ে, শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এর কারণই হল দেহে তড়িৎশক্তি হ্রাস পাওয়া।

এই শক্তি দ্বারা সম্মোহন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এক ব্যক্তি হতে এই তড়িৎ অপর ব্যক্তিতে চালনা করা যায়। যেমন দুটি পাত্র দুই মাপের অর্থাৎ কম বেশী জল রাখলেও দুই পাত্র নল দ্বারা সংযোগ করে দিলে বেশী জলের পাত্র হতে জল বেরিয়ে এসে অল্প জল পাত্রে মিলিত হয়ে সমান হয় তেমনি সম্মোহনকারীর দেহ হতে শক্তি বেড় হয়ে

সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। তড়িৎ যখন শরীরের ধারণক্ষমতার বাহিরে চলে যায় তখন মৃত্যু ঘটতে পারে। বজ্রপাতে, ইলেকট্রিক তারে মৃত্যুর কারণ হল শরীরের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তির অনুপ্রবেশ। তবে মানুষের দেহ হতে অপর মানুষের দেহে বিদ্যুতের চালনা করলে মৃত্যু হওয়া সম্ভাবনা কম। মানুষের দেহে একটি সীমিত শক্তির পরিমাণ থাকে। যার ফলে একটি দেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ থাকে অপর দেহে পূর্ব দেহেরই কিছুটা অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া মানুষের বিবেকবুদ্ধি সচেতন, সে বুঝতে পারে অপর দেহ কতটুকু শক্তি আহরণ করতে পারছে বা যে কাজের জন্য যেটুকু শক্তি দেওয়া দরকার সেইটুকুই সে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে। এটা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এই শক্তি সঞ্চালন মন দ্বারাই হয়। মন আত্মার এক স্বক্রিয় যন্ত্র। আত্মা মন সাহায্যে দেহ গঠন করে, স্থূল রাজ্যের যা কিছু প্রয়োজন তা সৃষ্টি করে নেয়। আত্মা নিষ্ক্রিয় থেকে শক্তির রশ্মির বিকিরণ ঘটায় অর্থাৎ আত্মা কিছু না করলেও তার থেকে রূপরসের চিৎকণ অবিরত ঝ'ড়ে পড়ে। মন সেগুলি সংগ্রহ করে দেহের কাজে লাগায়। দেহের কাজে লাগাবার আগে মন বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে দেখে নেন কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ভিতর শক্তি-তরঙ্গ গ্রহণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকলে Switch on করলে যন্ত্র চল্‌তে সুরু করে, তেমনি আত্মার শক্তি দেহের যথাযথ প্রবাহিত হয় বলে মন প্রাণ দেহ চলতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রে শক্তি-তরঙ্গের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। এক যন্ত্রের এক পরিমাণের শক্তি অন্য যন্ত্রে প্রবেশ করালে তার Movement হবে না। বরং সেই শক্তি ফিরে যাবে। মানব দেহের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী আত্মশক্তির পরিমাণ আছে। একজন চিকিৎসক ও একজন বিজ্ঞানীর মধ্যে আত্মশক্তির দ্বিবিধ ধরণের গুণের কাজ হচ্ছে। বিজ্ঞানী চিকিৎসক হতে পারে না আবার চিকিৎসক বিজ্ঞানী

হতে পারে না। এগুলি হল জন্মান্তরের মধ্যে বিভিন্ন ধৃতিশক্তির প্রকাশ। আত্মায় বহুবিধ শক্তি আছে বলেই যত জীব, যত মানুষ, যত দেবদেবীর বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানগুণ, আকার প্রকার কাজকর্ম বিভিন্ন ধরণের।

এখন এই যে মানবাত্মার শক্তি একে বৃদ্ধি করা বা হ্রাস করার শক্তি মানুষের আছে। একটি জেনারেটর হতে একলক্ষ ভোলটেজের কারেণ্ট নির্গত হয়, তাকে, ট্রেন্সফরমার দ্বারা কম করে ৪০ মাত্রায় এনে বাল্ব বাতি জালান যায়। Main Switch-এর মধ্যে কিন্তু একলক্ষ Voltage ধরা আছে। মানুষ সুবিধা মত তাকে হ্রাস বৃদ্ধি করে কাজ করে নিতে পারে। ঐ এক লক্ষ Voltage হতে বহুবিধ যন্ত্র চালান যেতে পারে এবং ঐ সমস্ত যন্ত্রের কাজ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে।

পরমাত্মা হল সর্বোচশক্তি যুক্ত Voltage আর আত্মা হল নিম্ন-শক্তির Voltage, মনই প্রবাহ Current, বিবেক Transformer, বুদ্ধি Switch আর দেহ motor মানবের মধ্যে পরমাত্মা, জীবাত্মা, মন, বিবেক, বুদ্ধি, দেহ সবই বিদ্যমান। যিনি এগুলি, অভিজ্ঞ ব্যক্তির সন্নিকট বুঝে নিয়ে পরিচালনা করতে পারেন তিনিই হন সর্বশক্তিমান। কারণ সর্বশক্তি তাঁর মধ্যে নিহিত। আত্মা সর্বব্যাপ্ত, সর্বানুস্যূত বলে আকর্ষণ বিকর্ষণ,—আহরণ ও বিহরণ দরকার হয়। বহিঃশক্তি আহরণ করে কাজ করা যেতে পারে আবার অন্তঃশক্তিকে জাগ্রত করেও কাজ করা যেতে পারে এ সমস্ত নির্ভর করবে যোগজ কর্মের গতি-প্রকৃতির উপর। যে কোন মানুষ যখন কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন তখন জানতে হবে তাঁর সর্বতোমুখী আত্মশক্তির একটি পর্ব তাঁর মধ্যে প্রকাশিত বা বিকশিত হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা কিছু না কিছু আত্মশক্তির পরশ পেয়েছেন। এই পরশ অবশ্য জন্মান্তরীণ সাধনার মধ্য দিয়ে আসে।

সমুদ্র যেমন সকল রত্নের আকর, মানবের হৃদয় সমুদ্রও বিবিধ রত্নাকর। মন-প্রবাহ যদি অন্তর্মুখী কিনা হৃদয়মুখী হয় তা হলে রত্ন সংগ্রহ সম্ভব। শক্তি সাধক রামপ্রসাদ সেই কথাই বলেছেন—

'ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদ রত্না করের অগাধ জলে'

আত্মমননশীল মানুষের পক্ষে সর্বশক্তি লাভ করা তাই সম্ভব কিন্তু জড় বস্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আরেকটি বিষয় জড়-পদার্থে চুম্বকের গুণ বা তড়িৎ-এর গুণ আপনা-আপনি অন্য দ্রব্যে সংক্রামিত হয়ে প্রবাহিত হয়, এটা সহজেই দেখা ও বুঝা যায়।

মানব শরীরে সে প্রকার স্বাভাবিক ভাবে এক শরীর হতে অন্য শরীরে শারীরিক তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হয় না। কারণ মানুষের বা জীবের শরীর কতকগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম গ্রন্থিদ্বারা গঠিত। গ্রন্থি কিনা গাঁট বা বাঁধন। এইগুলি রস, রক্ত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে আবার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থেকে জীবাত্মাকে মনকে চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এজন্য স্বাভাবিকভাবে বা সহজেই এক দেহ হতে অপর দেহে শক্তির চলন দেখা যায় না। মানুষকে তার দেহের শক্তি অপর দেহে চালন করতে হলে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পাশ বা যাঁর যে প্রক্রিয়া তার প্রয়োগ করতে হয়। তবে এটা ঠিক যে যিনি সম্মোহন কর্তা হবেন তাঁকে শিক্ষা বা সাধনাভ্যাসের দ্বারা সম্মোহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তির অধিকারী হতেই হবে, নচেৎ অন্যকে সম্মোহিত করা সম্ভব হবে না। মিডিয়ম প্রকারন্তরে ঐ সম্মোহন বিদ্যাই। এই সম্মোহন শক্তির অধিকারী হলে অপরকেও সম্মোহন করা যায়, নিজে নিজেও সম্মোহিত হওয়া যায়। সম্মোহনশক্তি বা তড়িৎশক্তি আহরণ করলে মানব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। তাঁর দৃষ্টি বহু বহু দূর প্রসারি হয়, বহু দূরের শব্দ শ্রবণগোচর হয়, বহু দূরের গন্ধ আঘ্রাণ করা সম্ভব হয়। টেলিফোনে জড় পদার্থের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করে শব্দ চালন করা হয়—মানব

চেষ্টা করলে অতীন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে সেগুলি দেখতে শুনতে পারে। দেহস্থ সুপ্তশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে মানুষ নিত্য বহুবিধ অসম্ভব কার্য সম্পাদন করে চলেছেন। পূর্ব পূর্ব যুগে মুনিঋষিরাও আত্মশক্তির বহুবিধ প্রকাশ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। প্রতি মানুষের মধ্যেই ঐ শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। এইগুলিকেই বলা হয়— দিব্যদৃষ্টি (clairvoyance), দিব্যশ্রুতি (clairaudiance), শক্তি-চালন (Telepathy), প্রাক্‌দৃষ্টি (Prevision), সাইকোমেট্রি (Psychometry)। এই সমস্ত শক্তির বিকাশ পাশ্চাত্য মনীষীগণ ঘটিয়েছেন। মনীষী লেড্‌বিটার, রুশ দার্শনিক ওস্‌পেস্কির, হাক্‌সলি, ব্লাভাস্কি প্রভৃতি মনীষীগণ বহু গবেষণাপূর্বক নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এবং এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ দেখিয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় যোগসিদ্ধ যোগীরা অষ্টসিদ্ধিরূপ বহু শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁরা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বহুবিধ সম্প্রসারণের উপায় ব্যক্ত করেছেন, যেমন ক্রিয়াশক্তি চিন্তা-চালন, দূর-প্রবৃত্তি (Tele-kinesis), ঊর্ধ্বগমন (Levitation), রুদ্ধগৃহ হতে নিষ্ক্রমণ।

মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে এর সাধন উপায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই সমস্তই হল মানুষের আত্মসত্তায় যে সুপ্তশক্তি নিহিত রয়েছে তারই বিকাশ। এইগুলি নিজের মধ্যে বিকশিত হলে অপরের মধ্যেও বিকাশ ঘটিয়ে দিতে পারা যায় বা নিজ দৃঢ় সঙ্কল্প শক্তিদ্বারা অপরের মধ্যে এগুলির বিকাশ ঘটান সম্ভব হতে পারে।

মিডিয়ম হল অপরের মধ্যে বিকাশ ঘটিয়ে দেওয়া। মিডিয়ম-ব্যক্তির দেহে যখন পরলোকের লোকান্তরের আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন সে বহু অদ্ভুত কাজ-কারবার করতে পারে বা করেও—যা জাগ্রৎ অবস্থায় তার পক্ষে করা সম্ভব হয় না—করে অবশে, দেহাত্মবোধ শূন্য হয়ে। মিডিয়ম অপরের শক্তিতে পরিচালিত, অপরের ভাবে

অনুপ্রাণিত ও অপরের প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু সম্মোহনকারী ব্যক্তি যোগশক্তিতে শক্তিমান হলে তিনি মিডিয়ম ছাড়াও নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মুহূর্তমধ্যে ইহলোকের খবর ছাড়াও লোকান্তরের খবর দিতে পারেন—তাদেরকেই যোগী মহাপুরুষ বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে বারদীর ব্রহ্মচারীর সাক্ষ্য ঘটনাটি উল্লেখ্য। তিনি একবার সাক্ষী দিতে গেলে বিচারক তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন দেড়শত বৎসর। বিচারক জিজ্ঞাসা করেন দেড়শত বৎসর বয়সে ঘটনাটি কিভাবে দেখতে পেলেন। তখন তিনি দূরে একটি তালবৃক্ষ দেখিয়ে বলেন—দেখুন ঐ তালবৃক্ষের মস্তকে কতকগুলি লাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছে আপনারা কি তা দেখতে পাচ্ছেন? কেহই দেখতে পাচ্ছেন না। তখন অনুসন্ধানে তাঁরা দেখলেন ব্রহ্মচারীর কথা সত্য। এখানে প্রমাণিত হয় ঐ যোগশক্তির দ্বারাই বহু বহু দূরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ভূত প্রেতের স্থূল শরীর না থাকায় বহু দূরের দৃশ্য ও ঘটনা দর্শন হয় বটে কিন্তু সেটা যোগী বা মহাপুরুষদের যোগদর্শনের মত উচ্চাবস্থা নয়। এগুলি অতিপ্রাকৃত। ইহা আবার দ্বিবিধ সহজ ও যোগজ। মিডিয়মও সেই হিসাবে যোগের একপ্রকার নিম্ন অবস্থা মাত্র—অপরের দ্বারা চালিত হয়ে যা কিছু কাজ করতে হয়। যোগী আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে নিজের ইচ্ছামত কাজ করে থাকেন। প্রকৃত যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন পুরুষদের কেহ সম্মোহিত করতে পারেন না। বরং তাঁদের যোগৈশ্বর্য প্রয়োগ করলে জীবের পক্ষে মঙ্গল হবে বুঝলে তাঁরা তখন প্রয়োগ করেন।

মিডিয়ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লোকোত্তরের আত্মাকে নামিয়ে এনে কথাবার্তা হয়, আত্মমুক্তির কোন ব্যবস্থা করা যায় না কিন্তু যোগীরা স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য প্রভৃতি লোক হতে আত্মাকে আকর্ষণ করে এনে মনুষ্য জন্ম ঘটিয়ে মুক্তি মোক্ষের ভূমিতে পৌঁছিয়ে দিতে

পারেন। এ সম্পর্কে পরমহংস স্বামী নিগমানন্দের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

"শিষ্য—মৃত্যুর পর যে সব শিষ্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তারা কিরূপ দেহ নিয়ে আসে?

নিগমানন্দ—মহর্লোক পর্যন্ত যে সমস্ত শিষ্যের গতি লাভ হয় তারা এই জগতের দেহের আকৃতির ন্যায় জ্যোতিঘন দেহ নিয়ে সাক্ষাৎ করে। দেহান্তে যারা তদূর্ধে গমন করে তারা এরূপ দেহ নিয়ে আসে না। তাদের তত্ত্বমূর্তি - আত্মা-বুদ্ধি-মন নিয়েই তাদের দেহ।

কিছুদিন আগে, মঠে রাত্রে শুয়ে পড়েছি, ঘুম এসে গেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, ঘরের ভেতর কিসের যেন একটা আলো। আমি তাড়াতাড়ি শয্যার ওপর উঠে বসলাম। দেখি মণ্ডলাকার একটা জ্যোতিঃ। জ্যোতিটা আস্তে আস্তে একটা রূপ গ্রহণ করল। তখন দেখি—আনন্দ, সে আমায় প্রণাম করে জোড়হাতে দাঁড়াল।

আমি বললাম—কি সংবাদ?

সে বলল—'ঠাকুর, কিছুদিন থেকে পুনরায় জন্ম গ্রহণের জন্য যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করছি'। তাকে বললাম - হ্যাঁ—এবার জন্ম হলে তোমার চরম মুক্তিলাভ হবে। তাই তোমার আর একটা জন্মের কথা আমার মনে হচ্ছিল।"*

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যোগী মহাপুরুষের আকর্ষণী শক্তি প্রবল তাঁরা জীবের মঙ্গলের জন্য তা প্রয়োগ করে থাকেন। আত্মাকে আকর্ষণ করে এনে জীবাত্মাকে মনুষ্য জন্ম ঘটিয়ে দিতে পারেন—উপযুক্ত গর্ভে প্রেরণ করতে পারেন। স্বামী নিগমানন্দদেব তাঁর এক আশ্রিত শিষ্যাকে ৭।৪।১৮ তারিখের পত্রে জানাচ্ছেন—'কত নিরন্ন পাষাণী

*নিগমানন্দ কথা-সংগ্রহ পৃষ্ঠা ৯৯

মায়ের ঘরে সন্তানের অবধি নাই আর তুমি একটি মাত্র সন্তানের জন্য লালায়িত—অথচ তাহাতে বঞ্চিত! আমি কত আত্মিককে তোমার গর্ভে প্রেরণের জন্য আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু কাহারও কর্মের সহিত তোমাদের সামঞ্জস্য করিতে পারি না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই হেতু এ পর্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। উভয় দিক সামঞ্জস্য না হইলে ভগবানের রাজ্যে আমার দ্বারা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। কাজেই সময়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এখন তোমার অদৃষ্ট।

আমি বিবেকচ্যুত হইলে নিজ শক্তি প্রয়োগে এতদিন তোমার বাসনা পূরণ করিয়া দিতাম; কিন্তু তোমরা যে ভাবীকালে অশান্তি ভোগ করিবে—সুখের পরিবর্তে নিয়ত দাবাগ্নীতে দগ্ধ হইবে! তাই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের সন্তানের নামে শয়তানের বোঝা চাপাইয়া দিতে পারি না। * * * যাহা হউক, আমি আরও কিছুকাল নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখিব, সাম্যাকৃতি কোন জীব পাই কিনা।"[১] এই উক্তি হতে বুঝা যায় যে যোগশক্তি বলে আত্মাকে আকর্ষণপূর্বক উপযুক্ত আধারে প্রেরণ করাবার শক্তি যোগীদের থাকে। এই যে যোগশক্তি তা দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি ভিন্ন কিছু নয়। যিনিই মনঃ সংযম, চিত্ত সংযম অভ্যাস করেন তিনি যোগশক্তি লাভ করে অলৌকিক কাজ করতে পারেন।

মিডিয়ম পরিচালক আচার্যের দেহ মনপ্রাণ বলিষ্ঠ সচেতন ও আনুভূতিক সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ় ব্যক্তি কখনও ঐ চক্রের পরিচালক বা সদস্য হতে পারেন না। জড়ের সঙ্গেও স্পন্দনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। দেহের জড়তা, মনের মূঢ়তা ও প্রাণের বিক্রিয়া কোনদিনই শক্তি উৎপাদন করতে পারে না। সেজন্য যে আচার্যের

১ ঠাকুরের চিঠি—৩।২৫

দেহমনপ্রাণ যত সংবেদনশীল তিনি তত শীঘ্র শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে থাকেন। চক্রে বহু সদস্য উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু যিনি পরিচালক হবেন—তাঁকে উহাদের হতে অধিক শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। সেইরূপ আচার্যের চিন্তা, ইচ্ছা ও কার্যকরণদ্বারা যেমন তাঁর নিজের স্থূলদেহ, মনোময়দেহ, প্রাণময়দেহগুলি স্পন্দন উৎপাদন করবে তেমনি সেই স্পন্দন দ্বারা অপরাপর ব্যক্তির দেহপ্রাণমনেরও স্পন্দনযুক্ত করবেন। যদি ঐ সমস্ত সদস্য আচার্যের স্পন্দনের তরঙ্গগুলি ধরতে অক্ষম হয় তবে তা তাদের অবচেতন মনে কিছু কিছু গ্রথিত হয়ে বাকী তরঙ্গ আচার্যের সন্নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। পুনঃপুন আচার্যের অনুভূতির তরঙ্গাঘাতে চক্রস্থিত সদস্যদের ইচ্ছা চিন্তা ধীরে ধীরে শক্তিযুক্ত, স্পন্দনযুক্ত, ও স্বচ্ছ অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠবে—ইহাই সৎ সঙ্গের ফল। যখন আচার্যের চিন্তার ভূমিতে সকলেই সহাবস্থিত হইবে তখন মুহূর্তের মধ্যে সকল অসম্ভব কার্য সম্পন্ন হবে। শরীরস্থ সূক্ষ্মকোষগুলি সর্বাধিক স্পন্দনযুক্ত হওয়া চাই আচার্যের। আচার্যত্ব লাভেচ্ছু ব্যক্তি তাঁর দেহ প্রাণকে শক্তিসম্পন্ন ও স্পন্দনযুক্ত করার জন্য—সচেষ্ট হতে হয়। দেহের পবিত্রতা-জন্য সাত্বিক আহার, পরিমিত আহার, যথা নিয়মে ব্রতাদি পালন মনের পবিত্রতা জন্য ধর্মমূলক গ্রন্থ ও যোগাদি গ্রন্থ পাঠ ও অভ্যাস। প্রাণের স্ফূরণের জন্য প্রতিজীবের সুখদুঃখগুলি নিজের ভাবনা করতঃ নিজেকে স্ব-সংবেদনশীল করে তোলা। পবিত্র কুঠরীতে দেবতার প্রতিকৃতি স্থাপিত করে, নির্মল ও প্রশান্ত চিত্তে প্রথম প্রথম শক্তি আহরণের ক্রিয়া অভ্যাস করতে হয়। দেহমন তৈরী হয়ে গেলে যে কোন স্থানে যে কোন ভাবে চললেও কিছু অসুবিধা হয় না। সেজন্য মিডিয়ম নিয়ন্ত্রণকারীর প্রধানতঃ তিনটি বিষয় ভালভাবে অভ্যাস করা দরকার—(১) মনস্থির করণ (২) জাগতিক সত্তা হতে প্রাণশক্তি সংগ্রহণ (৩) পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। যত্ন, অভ্যাস ও মনঃ সংযম একান্ত প্রয়োজন। আগেই

বলেছি সর্ববস্তুর মধ্যেই সুপ্ত ও ব্যাপ্তভাবে তড়িৎকণা বিদ্যমান আছে। এই তড়িৎকণাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণপূর্বক শরীরে ধারণ করার অভ্যাস করতে হয়—তবেই তড়িৎশক্তি শরীরে প্রবেশ করে। যেমন যোগাভ্যাসে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়। প্রাণায়াম কিনা প্রাণরূপ বায়ুকে শরীরে ধারণ। বাইরের বায়ুকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে গ্রহণ করে কুম্ভকপূর্বক ধারণ এবং পরে রেচন করতে হয়। এইভাবে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় শরীরে। প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পেলে শরীর জরা ব্যাধি মুক্তি হয় এবং মনঃশক্তি বৃদ্ধি পায়, ইহার দ্বারা অলৌকিকশক্তি লাভ করা যায়। এগুলি হল যোগের বিভিন্ন অবস্থা। মিডিয়ম নিমন্ত্রণকারীরা এতদূর অভ্যাস না করলেও একাগ্রতা লাভের জন্য যে কোনভাবে মনঃসংযম শিক্ষা করতেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ মিডিয়ম হওয়ার ইচ্ছা যাঁরা করেন, তাঁদেরও তৈরী হওয়া প্রয়োজন। মনকে তৈরী করতে হয়। মনই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মন কামনা দ্বারা সদাই বন্ধন অবস্থায় থাকে। বন্ধন হয় অবিদ্যা অজ্ঞানশক্তির প্রভাবে। অবিদ্যায় গ্রস্থ মনের বাসনাই বন্ধন। যা হোক মনকে শূন্য করার অভ্যাস করতে হয়। শূন্য মনেই অপর আত্মার আবির্ভাব ঘটে, প্রভাব বিস্তার করে, আলাপাদি করে। নির্দিষ্ট ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে মিডিয়ম নিয়ন্ত্রণকারীর কথা মত নিজেকে চালনা করার অভ্যাস। গৃহটি অন্ধকারময় রাখতে হয় তাতে প্রেতাত্মার আবির্ভাবের সুবিধা হয় ও মিডিয়মের মন শীঘ্র শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যেমন চক্ষু মুদ্রিত করে থাকলে ঘুম এসে যায় কিন্তু চক্ষু খোলা থাকলে ঘুম আসে না। ইহার কারণ হল চক্ষু যদি বিভিন্ন বিষয় বস্তু দর্শন করে তাহলে মনের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ ঘটায়, মন শূন্য হতে পারে না কাজেই ঘুমও আসে না। ভিতরে ঘুমের তন্ময়তা অতি বৃদ্ধি হলে চক্ষু ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয় তখন জীব ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘুমাতে হলে অন্ধকার ঘরে চোখ মুদ্রিত করে শয়ন করলেই নিদ্রা এসে থাকে।

শরীরের সঙ্গে মনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। শরীরকে শিথিল করে ছেড়ে দিলে মনও শিথিল হয়ে পড়ে। মিডিয়ম ব্যক্তির পক্ষে এগুলির সমস্তই লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। আরেকটি লক্ষ্য রাখতে হয়—মিডিয়ম নিয়ন্ত্রণকারীর কথাগুলি মন দিয়ে শুনে সেই মত কাজ করা। নিয়ন্ত্রণকারী যখন বলবেন 'ঘুমিয়ে পড়।' অমনি ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তিনি বারবার বলবেন। যিনি মনকে যত তাড়াতাড়ি শূন্য করতে পারেন তিনি তত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, নিজেকে অপরের কাছে সমর্পণ করে দিতে পারেন। দেহমন প্রাণ সম্পূর্ণ অপরের সন্নিকট সমর্পিত করে দিতে পারলে প্রেতাত্মা ঐ দেহ-মন প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে কাজ করেন। তবে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন—'প্রেতাত্মা মিডিয়মের সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গুলি না নিয়েও বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে অবলম্বন করে কাজ করতে পারে একথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

মিডিয়ম ছাড়াও এমন অনেক প্রেতাত্মা আছে যারা জীবের বা মানুষের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এদের বলা হয় ভূতযোনি। অস্বাভাবিক ভাবে যে সমস্ত মানুষের মৃত্যু হয় তারাই মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহে কষ্ট ভোগ করে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত উন্মাদের মত বিচরণ করে এবং সুবিধা পেলেই দুর্বল ভীরু মানুষকে আশ্রয় করে কাজ কারবার করার চেষ্টা করে। তখন সাধারণ মানুষ ঐ ব্যক্তিকে বলে উন্মাদ পাগল। তবে উন্মাদ পাগল যে শুধু ভূতে আক্রমণ করলেই হয় তা নয়। শারীরিক যন্ত্রের গোলযোগ জন্যও হতে পারে। যে ব্যক্তি শারীরিক যন্ত্রের গোলযোগে উন্মাদ হয় সে ব্যক্তিকে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত করলে ভাল হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু প্রেতাত্মার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন যাঁরা

তাঁদেরকে চিকিৎসক কিছু করতে পারেন না। ভাল ওঝা, মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করে অনেকে ভাল করে থাকেন।

প্রেতাত্মারা ইহজগতের নেমে আসার মোটামুটি কয়েকটি কারণ হল —

(১) ভোগাসক্ত, দুর্বিত্তপরায়ণ ব্যক্তি দেহত্যাগ করেও স্বভাবের বশে সেই সেই বৃত্তিগুলি মন হতে ত্যাগ করতে না পারায় মৃত্যুর পরও মানুষকে আক্রমণ করার বা প্রবৃত্তিমূলক কাজ করার চেষ্টা করতে পারে।

(২) দেহত্যাগে সদ্‌গতি না হওয়ায় কোন কোন আত্মা নিজের অন্তরঙ্গ জনদের পাশে পাশে অবস্থান করার চেষ্টা করে। কিছু কথা বলবার চেষ্টা করে।

(৩) অনেক আত্মা মানুষের পর-উপকার করবার জন্য নিজের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে তেমনি মানুষকে আশ্রয় করে ব্যাধির জন্য ঔষধ, সাংসারিক নানান সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থাপত্র প্রদান প্রভৃতি কাজ করে নিজের আত্মমুক্তি করার চেষ্টা করে। পর-উপকার মানুষের যেমন জীবনে মঙ্গলজনক, প্রেতাত্মারও তেমনি মঙ্গলের হেতু।

এই সমস্ত কারণে প্রেতাত্মা এই জগতে আবির্ভাব হতে পারে, দর্শন দিতে পারে, কারো উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এগুলি হল প্রেতাত্মার নিজস্ব ইচ্ছায় আবির্ভাব। কিন্তু মিডিয়মে তাঁকে ডেকে আনা হয়। উপযুক্ত ব্যক্তি, উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে যথা সময়ে তাকে ডেকে আনলে সে না এসে থাকতে পারে না।

প্রেতাত্মারা যে কথাবার্তা বলে বা ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করে বা নানান অলৌকিক ঘটনার ইতিবৃত্ত প্রদান করে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে কাজে পরিণত হয়ে যায়। তার কারণ হল সূক্ষ্মদেহের পরিধি বিস্তৃত, ইন্দ্রিয়গুলি বহু দূরের ঘটনাদি

দর্শন শ্রবণের উপযোগী থাকে। যেমন পঞ্চভূত একটি হতে অপরটির পরিধি ব্যাপ্ত হতে চায়। মৃত্তিকা হতে জল সহজেই ছড়িয়ে পড়তে চায়, আগুন আরো তাড়াতাড়ি বায়ুতে মিলিয়ে যেতে চায়, বায়ু আকাশে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এখানে একটি থেকে অপরটি ব্যাপ্তধর্মী। তেমনি স্থূলদেহে থেকে সূক্ষ্মদেহ ব্যাপ্ত, সূক্ষ্মদেহ হতে কারণদেহ ব্যাপ্ত। সেজন্য সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম জিনিষগুলি দেখতে পায় বলে বলা সহজ হয়। ইহা প্রেতাত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান, কিন্তু তাই বলে তাদের জ্ঞান সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের সমান নহে, কারণ প্রেতাত্মার সূক্ষ্মদেহের দৃষ্টি ও কৃতির একটি সীমা আছে। সর্বব্যাপী ঘটনা বলবার ক্ষমতা তার থাকে না। এ সম্পর্কে মিঃ বার্ণার্ড বলেছেন—Telepathy across 600 miles is no more difficult to understand than across six feet, since space is apparently quite irrelevant to it. কিন্তু যোগী মহাপুরুষরা ইহজীবনে সূক্ষ্মদেহ বা কারণদেহের বিনাশ ঘটিয়ে দিব্যদেহ, চিন্ময়তনু লাভ করেন। তাঁদের দিব্যদেহের উপাদান সৎচিৎ আনন্দময়। এই সত্ত্বতণু লাভ করলে দেবদেহে মানুষ যুগ যুগ ধরে অবস্থান করতে পারে। দেবদেহও ব্যাপ্তিময় দেহ। মানুষ দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব-ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে—এ প্রমাণ শাস্ত্রে বিরল নহে।

প্রাকৃত জগৎ ও প্রাকৃত দেহ হতে অপ্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত-দেহের জ্ঞান লাভ হলে সাধারণ মানুষ তাঁকে ধরে লোকোত্তরের সন্ধান খুঁজতে চেষ্টা করে। সেজন্য শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ মহাপুরুষ-গণকে মানুষ পূজা করে থাকে, নিজের প্রাণে কামনা-বাসনা নিবেদন করে—যাতে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ হয়। কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতির উপাসনার মূলেও ঐ বিভিন্ন প্রকারের কামনা-বাসনার আবেদন নিবেদন। প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা নিয়ে যদি তার কাছে যে কোন বিষয় নিবেদন করা যায় তিনি তা পূরণ করে দিয়ে

থাকেন। মানুষ যে দেব-উপাসনা করে তাও ঐ আকর্ষণী যোগ শক্তি ভিন্ন কিছু নয়। বহু দেবতার নাম পাওয়া যায়, বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন প্রকার গুণ ও শক্তি। নিজ ভাবানুযায়ী সেই দেবতাকে ডাকলে বা প্রার্থনা করলে তিনি দর্শন দেন, প্রার্থনা পূরণ করেন। দেবতারা আসেন লোকান্তর থেকেই। কাজেই এখানেও বিভিন্ন সাধক, যোগী, মুমুক্ষু, উপাসক নিজ নিজ ইষ্টদেবকে প্রাণের আকুলতা ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে নামিয়ে আনতে পারেন বা নামিয়ে এনে থাকেন। বিভিন্ন লোকের দেবতাগণও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ভূলোকের দেবতারা হলেন — অগ্নি, অপ, পৃথিবী, সোম, আপ্রীদেবগণ প্রভৃতি। অন্তরীক্ষলোকের দেবতা—ইন্দ্র, মরুৎ, আপাং-নপাৎ, বায়ু, পর্জন্য প্রভৃতি। দ্যুলোকের দেবতা—সূর্য, মিত্র, আদিত্য, অশ্বিযুগল, রাত্রি, বরুণ, পুষা, উষা প্রভৃতি। এই তিন লোকের দেবতাদের একটি প্রাকৃত বা লৌকিক মূর্ত মূর্তি আছে শরীরধারী পুরুষের ন্যায় তাঁর মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর আনন ও পৃষ্ঠদেশ ঘৃতবর্ণ, কেশরাশি স্ফুলিঙ্গবর্ণ, শ্মশ্রুপিঙ্গল এবং দন্তপংক্তি সুবর্ণ, চিবুক সুগঠিত ও উন্নত। এমনি অনেক বর্ণনা আছে।

তাছাড়া প্রতি দেবতার ধ্যানমন্ত্রে সেই সেই দেবতার রূপের বর্ণনা আছে দেখতে পাওয়া যায়। ঐ দেবতার মন্ত্র কিনা নাম জপ ও মনে মনে তার জপের চিন্তা করার নিয়ম আছে। এই নাম জপ ও জপের ধ্যান করলে দেবতার আবির্ভাব না হয়ে পারে না। আর যিনি যে দেবতার নাম রূপ গুণ চিন্তা করেন সেই দেবতার রূপ গুণ তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি ও তাঁর ইষ্টদেবতা তাঁর সন্নিকট দুই থাকে না, একাকার হয়ে যায়। উহা দিব্য-মিডিয়মের অবস্থা। প্রেতাত্মা ও মিডিয়ম এক সময় একাকার অবস্থায় পৌঁছায়। মিডিয়মের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হলেই প্রেতাত্মার কাজ আরম্ভ হয়। এখানে প্রেতাত্মা ও মিডিয়মের কাজকে দেব-উপাসনার ন্যায় মনে হতে পারে

কিন্তু প্রকৃত তা নয়। প্রেতাবিষ্টের পর মিডিয়মের শারীরিক অবস্থা, মনের অবস্থা দিন দিন কুভাবাপন্ন, চঞ্চল ও নিম্নগামী হয়ে যায়। কিন্তু দেব-উপাসনায় মানুষের দেহ-মন-প্রাণে অটুট বল-বীর্য-সাহস সঞ্চারিত হয়। দেহ লাবণ্যময়, মন উর্ধমুখী ও প্রাণ আনন্দময় হয় দিন দিন। এই হল প্রেতাত্মা, মিডিয়ম ও দেব-উপাসনার মধ্যে পার্থক্য। দেব-উপাসনায় যে মানুষের আত্মার শান্তি ও কল্যাণ হয় তা প্রেতাত্মাদের সন্নিকট হতেও শোনা যায় এর বহুল প্রমাণের অভাব নাই।

মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় প্রণীত 'পরলোকের কথা' গ্রন্থে ১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে—"রাজকৃষ্ণ মিত্রের 'শোকবিজয়' গ্রন্থে নিত্যরঞ্জনের পরিচয় এইরূপ আছে—বারাসত নিবাসী নিত্যরঞ্জন ঘোষকে নিশিতে পাইয়াছিল। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ যাইরে বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া শ্মশানে যাইয়া বসিয়াছিল। আর একদিন রাত্রে ঐ ভাবে উঠিয়া আমাদের বাগানের ঝিলে যাইয়া এক গলা জলে বসিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যহ এইরূপ করিতে থাকায়, তাহার অভিভাবকরা তাহাকে কলিকাতায় আমার কাছে চিকিৎসার্থে পাঠাইয়া দেন।

নিত্য আসিবার মাত্র আমি এক গ্লাস জল মেস্‌মেরাইজ করিয়া, ঐ জলের দিকে তাহাকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে বলিল যে, গ্লাসের মধ্যে দুইখানি ছোট হাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে হাত দুইখানি ক্রমে বড় ও তেজোময় হইল। ইহা দেখিয়া সে অত্যন্ত ভয় পাইল ও গ্লাস ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সেখান হইতে ৪৫ জন লোক তাহাকে ধরিয়া আনিলে দেখা গেল, তাহার সর্বশরীর স্পন্দনহীন ও লোহার মত শক্ত, চক্ষু মুদ্রিত অথচ তারা উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং চোয়াল বন্ধ রহিয়াছে। তখন তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া, মাথা হইতে পা পর্যন্ত ৭।৮ বার ও চোয়ালে কয়েকবার 'পাস' দিলে, তাহার

দাঁতকপাটি ছাড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ আউ আউ করিয়া শেষে সে বলিল—'কেন আমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ?'

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, তাহার নাম ভোলানাথ মুখার্জী, বাড়ী যশোহর জেলায়। ৩০ বৎসর পূর্বে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া রাস্তা দিয়া যাইবার সময় ৪।৫ জন লোক বিষ-মাখান শড়কি মারিয়া তাহাকে হত্যা করে। অপর কেহই ইহা জানে না। ঐ টাকা কেহ লইতে পারে নাই, দেওয়ালে পোঁতা আছে। হত্যাকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রেতাত্মা কিছুতেই বলিল না।

পরদিন অর্থাৎ ১৮৮১ সালের ৫ই জুন রবিবার রাজকৃষ্ণবাবু নিত্য নিরঞ্জনকে লইয়া বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে গেলেন। মার্কিন-দেশীয় অনারেবল ক্রুস, মিউজেন্স সাহেব এবং প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি আরও ১৫।১৬ জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিত্য নিরঞ্জনকে লইয়া তখনই চক্রে বসা হইল। অল্পক্ষণ পরে তাহার উপর এক প্রেতাত্মার ভর হইল। সে তৎক্ষণাৎ চক্র হইতে উঠিয়া নক্ষত্রবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল ও দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। ইহা দেখিয়া সকলে চক্র হইতে উঠিয়া বাগানের গেটের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় ক্রুস সাহেবের পরামর্শ মত রাজকৃষ্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আদেশ করিলেন যে, নিত্য যেখানে যে ভাবে আছে ঠিক সেইভাবে থাকুক। তারপর নিত্যর অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠান হইল। একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নিত্য আবিষ্ট অবস্থায় কিছু দূরে রাস্তার ধারে একটা খেজুর গাছের কাছে, সাহেবদিগের 'পল্‌কা' নাচের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে, অনবরত খেজুর গাছে উঠিতেছে ও নামিতেছে। একজন হিন্দুস্থানী তাহাকে ধরিতে গিয়াছিল, কিন্তু নিত্য তাহাকে বাম হাত দিয়া এমন ধাক্কা দিল যে, সে দুই তিন হাত দূরে যাইয়া পড়িল।

এই কথা শুনিয়া রাজকৃষ্ণবাবু তাহার নিকট গেলেন এবং ক্রুস

সাহেবের কথামত তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার আদেশে নিতান্ত ভাল মানুষের মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে ফিরিয়া আসিল। তখন তাহাকে বৈঠকখানায় শোয়াইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত কয়েকবার 'পাস' দেওয়ায়, সে স্থির হইয়া রহিল। তারপর আরও কয়েকবার 'পাস' দেওয়ায়, যে প্রেতাত্মা ভর করিয়াছিল, সে মিডিয়ম দ্বারা আপনার পরিচয় দিল। ইহাতে জানা গেল, এই জগতে থাকিতে সে সর্বদা অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল, কখনও ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত স্মরণ করে নাই। এই অবস্থায় পরজগতে যাইয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং এক্ষণে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি বটগাছে আশ্রয় করিয়া আছে এবং খুবই কষ্টভোগ করিতেছে কিন্তু সেইদিন চক্রে আসিয়া শ্রীভগবানের নাম-গান শুনিয়া অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

এই সময় 'বৃটিশ ন্যাশানাল এসোসিয়েশন অফ স্পিরিচ্যুয়ালিষ্টস' নামক বিলাতের এক পারলৌকিক সমিতির সভাপতি আলেকজেণ্ডার কলডার সাহেব কলিকাতায় আসেন। তিনি কলিকাতার আধ্যাত্মিক সমিতির পরবর্তী দুটি অধিবেশনে ও চক্রে যোগদান করিয়াছিলেন। মার্কিনদেশীয় অনারেবল ক্রুস ও বিলাতের কলডার সাহেবের উপস্থিতিতে জুন মাসের চারটি রবিবারে অধিবেশনের ও চক্রের সুন্দর-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

১২ই জুন তারিখে বেলগাছিয়ার বাগানে বেলা ৪॥টার সময় চক্রে বসা হয়। তাহাতে—এ কলডার, জে. জি. মিউজেন্স, প্যারীচাঁদ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। শেষোক্ত দুইজন মিডিয়ম ছিলেন। চক্রে বসিবার প্রায় ১৫ মিনিট পরে ইহাদিগের দুই জনের উপর আত্মার ভর হয়। সত্যচরণের আবেশের অবস্থা বেশীক্ষণ ছিল না। নিত্যনিরঞ্জন বিশেষভাবে আবিষ্ট হয় এবং মিউজেন্স ও প্যারীচাঁদ তাহাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করেন। মিডিয়মের

মুখ দিয়া বাঙ্গলায় ইহার যে উত্তর বাহির হয় তাহার মর্ম পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

যথা—'আমার নাম মধুসূদন মিত্র। আমি প্যারীচাঁদের ভাই। এখানে বিশেষ অশান্তিতে আছি। প্যারীচাঁদকে গোপনে কিছু বলিব।'

এই কথা শুনিয়া মিডিয়ম ও প্যারীচাঁদবাবু ব্যতীত অপর সকলে ঘরের বাহিরে গেলেন। ৮।১০ মিনিট পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, প্যারীচাঁদবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাই যে নিত্যের উপর ভর করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার নিজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

এই আত্মা ছাড়িয়া গেলে, আর একজন নিত্যের উপর ভর করিয়া বলিলেন যে, তাহার নাম শরৎচন্দ্র মিত্র। তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। এক বৎসর পূর্বে পীড়িত অবস্থায় তিনি তাঁহার নিকট-আত্মীয় ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট কালীচরণ ঘোষের মির্জাপুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ছিলেন। এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই।

তৎপরে তিনি বলিতে লাগিলেন—এখানে আমি বেশ আনন্দে আছি। ভগবানের ভজন ভিন্ন আমার এখানে আর কোন কাজ নাই। এখানে জাতিগত বা বর্ণগত কোন পার্থক্য নাই। দেহত্যাগের সময় এখানে আসিয়া পরলোকগত আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিয়া প্রথমে আমি ভয় পাইয়াছিলাম। এখন তাঁহাদের সঙ্গে বেশ আনন্দে আছি। আমি যেখানে আছি, এখানে সবই আনন্দ ও সুখময়। আমার পিতা-মাতা আমার বিরহে শোকে অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে আমার কথা জানাইবার জন্য আমি আজ এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আপনারা তাঁহাদিগকে জানেন না বলিয়া আমার আত্মীয় কালীচরণ ঘোষের নাম করিলাম।

যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই শরৎকে চিনিতে পারিলেন না। এই সময় রাজকৃষ্ণ মিত্র সেখানে আসিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন যে—শরৎকে তিনি জানিতেন। এবং সে তাঁরই চিকিৎসাধীনে ছিল। তাহার সকল কথাই ঠিক।

১৯শে জুন তারিখের চক্রে নিত্যরঞ্জনের উপর এক আত্মার ভর হয়। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ তর্করত্ন। বারাকপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল। ছয় বৎসর পূর্বে তিনি পরজগতে গিয়াছেন। এই চক্রেও কলডার সাহেব ও সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে জুন তারিখে চক্রে বসিয়া মিউজেন্স সাহেব প্রথমে নিত্যকে মেস্‌মেরাইজ করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ মেস্‌মেরাইজ করিবার পর নিত্য ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল; তারপর বলিল—"ঐ আর্শির মধ্যে দুইজন যোগী দাঁড়াইয়া আছেন।" আরও কিছুক্ষণ মেস্‌মেরাইজ করিবার পর সে টেবিলের উপর অচেতন হইয়া পড়িল। তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়ান হইল। একটু পরে তাহার ডান হাত একটু একটু নড়িতে লাগিল। তখন মিডিয়মের হাতে পেন্সিল দিয়া, যে আত্মা ভর করিয়াছিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনি কে?" ইহার উত্তরে নিম্নের অদ্ভুত ঘটনাটি মিডিয়মের হাত দিয়া লেখা হইল ঃ—

আমার নাম, গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। পশ্চিম অঞ্চলে আমার বাড়ী ছিল। ২২ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি। তখন আমার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। আমার পিতামাতা কাশীধামে বাস করিতেন। আমার বয়স যখন ১৮ বৎসর তখন প্রথমে বাবা, এবং তিন সপ্তাহ পরে মা দেহত্যাগ করেন। তখন ঐ পৃথিবীতে আমার আপনার বলিতে অপর কেহই ছিলেন না। পিতামাতার অভাব আমি জগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম। আমার

তখন আর বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল না। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ক্রমে এক সাধুর দর্শন পাইলাম। প্রথমে তিনি আমাকে বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িলাম না। তখন তিনি সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। এইভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল। শেষে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে দ্বাদশ বৎসর কাছে রাখিয়া তাঁহার সকল বিদ্যা শিখাইলেন। অবশেষে আমাকে সেই স্থানে থাকিয়া ভজন-সাধন করিতে বলিয়া, তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ইহার পর আর তাঁহার খোঁজখবর পাইলাম না। সেখানে আরও কয়েক বৎসর থাকিয়া শেষে আমি বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলাম। কিছুকাল পরে আমি দেহত্যাগ করিলাম।

এই জগতে আসিয়া ক্রমে অনেক পবিত্র আত্মার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের সহিত নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে এক স্থানে এক পবিত্র জ্যোতির্ময় মূর্তির দর্শন পাইলাম। তিনি বলিলেন যে, ইহাই পুণ্যাত্মাদিগের স্থান। ইহার নাম ষষ্ঠস্বর্গ। এখানে থাকিয়া সাধন-ভজন কর। তাঁহার আদেশ মত আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। সেখানে যে সমস্ত মনোহর বস্তু নয়নগোচর হইল, তাহা দেখিয়া আমি আত্মহারা হইলাম এবং মন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইল। সে আনন্দ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

প্রথম প্রথম নিত্যের উপর নিম্নস্তরের প্রেতাত্মার ভর হইত বলিয়া সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িত। ক্রমে অপেক্ষাকৃত ভাল আত্মার ভর হওয়ায়, তাহার কষ্ট কমিতে লাগিল। তখন সে সুস্থির ও শান্তভাবে কথা বলিতে ও লিখিতে পারিত। ক্রমে সে যতই অধিক শক্তি অর্জন করিতে লাগিল, ততই তাহার উপর উচ্চস্তরের মুক্তাত্মা-দিগের ভর হইতে লাগিল। নিত্য সেরূপ শিক্ষিত বা বুদ্ধিমান ছিল

না। সুতরাং আবিষ্ট হইয়া সে যে সকল উপদেশ দিত, সে সব যে তাহার নিজের কথা নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইত।

নিত্যনিরঞ্জনের এই ক্রমোন্নতির একমাত্র কারণ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা। প্রথমে যখন তাহার উপর ভোলানাথের আত্মার ভর হইত, তখন ভোলানাথ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। কাজেই তাঁহার ভর হওয়ায় নিত্যনিরঞ্জনের কষ্টের একশেষ হইত। চক্রে আসিবার পর হইতে ভগবানের প্রার্থনা-সঙ্গীত শুনিয়া ও উচ্চস্তরের পবিত্র আত্মাদিগের সংসর্গে আসিয়া ক্রমে ভোলানাথের উন্নতি হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ শান্তি ও আনন্দ পাইতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ভোলানাথের আত্মার ভর হইলে মিডিয়মের পূর্বের ন্যায় আর ক্লেশ হইত না। এইরূপ বার বার ভর করিয়া নিত্যের উপর তাহার বাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তখন ভোলানাথের আত্মার প্রধান কার্য হইল দুষ্ট প্রেতাত্মাদিগের কবল হইতে নিত্যকে রক্ষা করা।"—

ইহা হতে বুঝা যায় ইহজগতে যেমন দুষ্ট মানুষ অপরকে দুষ্ট প্রকৃতিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, পরলোকেও দুষ্ট প্রেতাত্মা মিডিয়মকেও তার মত করতে চেষ্টা করে। তবে যে সমস্ত প্রেতাত্মা কোন কারণ বশতঃ নিম্নপ্রকৃতিমূলকভাবে কালক্ষেপ করেন এবং কোন কারণে যদি ভাল হয়ে যায় তাহলে অন্যকেও ভাল করার চেষ্টা করে—সেটা মিডিয়ম নিত্যনিরঞ্জনের ও ভোলানাথের ঘটনা হইতেই পাওয়া যায়।

প্রেতাত্মা ও যোগাযোগ উপায়

মৃত-আত্মার সঙ্গে যে আলাপাদি সংঘটিত হয় তার বিভিন্ন মাধ্যম আছে। সাক্ষাৎ ভাবে উপস্থিত হয়ে কথাবার্তাও তারা বলতে পারে তার উদাহরণ যে না-আছে তা নয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে-সকল আত্মা পরলোকে বসবাস করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, সেখানে বন্ধু-বান্ধব পেয়ে গেছে, সংসার গড়ে তুলছে—সেই সমস্ত আত্মা পুনরায় পৃথিবীতে এসে যোগাযোগ করতে কষ্ট অনুভব করে থাকে। অবশ্য যে সমস্ত আত্মার ইহলোকের আত্মীয়, স্বজন, বিষয়ের উপর আসক্তি, প্রীতি, টান আছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা স্বেচ্ছায় গমনাগমন করে।

যাদেরকে আকর্ষণ করে নামিয়ে আনা হয়, আলাপাদি করার চেষ্টা করা হয় তারা যে সমস্ত উপায় দ্বারা আলাপাদি করে থাকে তার কিছু কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগের এগুলি মাধ্যম।

লোকাত্মক জগৎ ক্ষিতিপ্রধান কিনা জড়ের প্রাধান্য। সেজন্য সূক্ষ্মতত্ত্ব ছাড়া সূক্ষ্ম জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হতে পারে না। আমরা আগেও বলেছি সূক্ষ্মভূতের সূক্ষ্মতম অংশ হল তন্মাত্র। মাটির তন্মাত্র, জলের তন্মাত্র, আগুনের তন্মাত্র প্রভৃতি। এই তন্মাত্রের স্থূলতম রূপ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। এই পঞ্চভূতের একটি হতে অন্যটি ব্যাপ্তিবোধ অধিক। এই পঞ্চভূতের আবার গুণ আছে—যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, অগ্নির গুণ রূপ প্রভৃতি। স্থূল ভূত হতে ভূতের সূক্ষ্ম গুণগুলি দ্বারা সূক্ষ্মভূতাত্মার যোগাযোগের মাধ্যম হয়।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এগুলিদ্বারা প্রেতাত্মার পক্ষে যোগাযোগ করা কিছুটা সহজ হয়। আলাপন, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন ও

আঘ্রাণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি এক একটি ভূত হতেই সৃষ্ট, ভূতের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা। সাধারণতঃ শব্দ দ্বারাই আলাপ হয়, স্পর্শ দ্বারা আঘাত, রূপ দ্বারা দর্শন, বস্তু দ্বারা আস্বাদন, গন্ধ দ্বারা আঘ্রাণ করা যায়। মানব শরীরের আত্মা ও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যথাযথভাবে সংযোগ না ঘটলে এগুলি সম্পাদিত হয় না। যেমন আলাপন মুখ দ্বারা, ত্বক দ্বারা স্পষ্ট চক্ষু দ্বারা দর্শন, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, নাক দ্বারা আঘ্রাণ করা হয়। মানুষের পক্ষে এই মুখ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাক প্রভৃতি দ্বারা সূক্ষ্মভূতের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু এখন কথা হল সূক্ষ্ম প্রেতাত্মা কিভাবে যোগাযোগ করতে পারে? সূক্ষ্মদেহেও ইন্দ্রিয়গুলি থাকে সূক্ষ্মভাবে। যেমন আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখনও হাঁটি, চলি, বলি, দেখি সূক্ষ্ম স্বপ্নময় জগতে। অথচ আমাদের তখন মোটেই স্থূল দেহ, চক্ষু, হস্ত পদ প্রভৃতি কাজ করে না। এও ঠিক তেমনি।

এখন কি কি মাধ্যমে বা উপায়ে ও কিরূপ ভাবে প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তারই কিছু কিছু বিষয় এখানে দেওয়া হল :—

(১) অতীন্দ্রিয় বা দিব্যদৃষ্টি (chairvoyance)। চক্ষুই আমাদের কাছে প্রধান ইন্দ্রিয় যার দ্বারা এই জগৎকে আমরা সন্দর্শন করি। জগৎ দর্শন মানেই হল সৃষ্টির সব কিছুকে দর্শন। যে দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জীবনে কত অভিজ্ঞতা, রূপসৌন্দর্য, আত্মপ্রীতি পূর্ণভাবে লাভ করি। চক্ষু থাকলেই যে সকলের চক্ষু সকলের সন্নিকট সমান গুরুত্ব সম্পন্ন তা কিন্তু নয়। সেজন্য কবির চক্ষুর দৃষ্টি আর সাধারণ মানুষের চক্ষুর দৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টিগত ও গুণগত অনেক প্রভেদ থাকেই। আবার সাধারণ মানুষ হতে নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ তামস-প্রধান মানুষের চক্ষুর অবলোকন দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য থাকে। যাহোক স্থূল জগতের মানুষের জ্ঞান বিদ্যা অনুযায়ী দৃষ্টির গভীরতা স্বচ্ছতা নির্ভর করে।

এই স্থুল দৃষ্টি বা চক্ষুর পেছনে আরেকটি চক্ষু থাকে তাকেই বলে দিব্যচক্ষু। কেনোপনিষদে আমরা পাই—চক্ষুর চক্ষু। এই চক্ষু দিয়ে যাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না—'যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি।' সেজন্য মিডিয়ম ব্যক্তি বাহ্যতঃ অচৈতন্য অবস্থায়, চক্ষু মদ্রিত অবস্থায় পরলোক, পরলোকগত আত্মাগুলিকে দর্শন করে থাকে। চক্ষু উন্মিলিত করেও অনেকে দর্শন করতে পারেন। দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যাদের সহজাত হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষেই ইহা সম্ভব। মিডিয়ম বা মেস্‌মেরাইজ ছাড়াও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা খোলা চোখেই এক এক সময় অতীন্দ্রিয় বিষয় প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এগুলি হঠাৎ ঘটে যায়। তাছাড়া মনঃ সংযম দ্বারা এই প্রকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যে সম্ভব পতঞ্জলি যোগদর্শনে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যোগের ত্রাটক অভ্যাস ইহারই এক সাধন প্রক্রিয়া মাত্র। দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক অনেক আলোচনা মনীষী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় তাঁর বেদান্ত ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রবন্ধে দিয়েছেন তারই কিছু অংশ তুলে ধরা হল। Clairvoyant কে? ইহার উত্তরে—হডসন সাহেব তাঁর Science of Seership এইরূপ বলেছেন—

A clairvoyant is one who possesses a considerable wider range of vibratory response than is normal at the present stage of human evolution.

It is simply a question of turning-in to wave-length to which the sense organs and brain cannot normally respond * * * It is question of mental rappost—The capacity of mental turning-in—E. G. as in wireless, এই কথাই পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-জ্ঞানম্—বিভূতি পাদ। অর্থাৎ সাধন বলে যোগী দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন—যদ্দ্বারা তিনি সূক্ষ্ম

(যথা পরমাণু প্রভৃতি যাহা স্থূল দৃষ্টির অগোচর), ব্যবহিত (ব্যবধানযুক্ত, যথা প্রস্তর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ) এবং বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থ, যেমন কলিকাতায় বসিয়া দিল্লীস্থ) বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহা উচ্চাঙ্গের clairvoyance – যোগ বিভূতি, যোগ সিদ্ধির ফল,— সাধনজ। শাস্ত্র গ্রন্থে এরূপ বহু যোগীর উল্লেখ আছে, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন এবং অতিদূরস্থ বস্তুও 'করকবলিত-কুবলয়বৎ' দর্শন করিতেন। বর্তমানে এরূপ যোগীর অভাব হইয়াছে, তাহা নহে। যাঁহাদের এ সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা আছে—তাঁহারা এরূপ তো কোন না কোন যোগীর পরিচয় নিশ্চয়ই জানেন। শুধু এদেশে নহে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও এরূপ যোগী দৃষ্টি গোচর হয়েন। অনেকেই বোধ হয়, সোয়েডন্‌বর্গের নাম শুনিয়াছেন। সুইডেন তাঁহার জন্মভূমি ছিল। তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি বলে সোয়েডন্‌বর্গ কিরূপে দূরস্থ বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহার একটি প্রামাণিক ঘটনা আমার ঐ কর্মবাদ ও জন্মান্তর গ্রন্থে বিবৃত আছে।

এতক্ষণ আমরা যোগজ দিব্যদৃষ্টির কথা বলিলাম। কিন্তু অ-যোগজ দিব্য দৃষ্টির দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নহে। সময়ে সময়ে দেখা গিয়েছে হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। ডাক্তার লাম্‌ব্রোসো এইরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

Lombroso had a patient who was an hysterical young girl. At time she failed to see with her eyes, but yet saw with her ear! With her eyes suitable bandaged, she read print which was held to one of her ears.

হিষ্টিরিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সোলিয়ার ও কোমার তাঁহাদের চিকিৎসাধীন রোগীদিগের মধ্যে এই দিব্যদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া উহাকে

Internal Autoscopy (অন্তর আত্মদর্শন) নামে অভিহিত করেছেন। ঐ রোগীরা দেহ-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও নিজ শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রক্রিয়া (যথা, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, ফুসফুসের চলন, রক্তের চলাচল ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ করিয়া যথাযথ বর্ণনা করিত। * * *

দিব্যদৃষ্টি দ্বিবিধ—দৈশিক ও কালিক—clairvoyance in space and clairvoyance in time. * * * দৈশিক—x-ray vision at long range। যে দিব্যদৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ বলা যায় তাহার নাম কালিক clairvoyance। কেহ কেহ ঐ দিব্যদৃষ্টিকে Premonition or Precognition বলিয়াছেন।[১]

এখন যোগজ দিব্যদৃষ্টি ভিন্নও অতি সাধারণ মানুষেরও যে ঐ দৃষ্টি খুলে যেতে পারে তার একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

"শশীমুখী নাম্নী আমাদের এক আত্মীয়া আমাদের চক্রে বসিতেন। তিনি চোখ বুজিয়া মনঃসংযোগ করিয়া বসিলেই, পরলোকগত ব্যক্তি-দিগের আত্মা দেখিতে পাইতেন। এমন কি, তাঁহাদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ও হৃদয়ে-হৃদয়ে কথাবার্ত্তাও চলিত। চক্রে না বসিয়া নির্জনে ঐভাবে বসিলেও তিনি ঐরূপ দেখিতে পাইতেন। মেসমেরাইজ করিলে এইভাব দেখা যায় সত্য, কিন্তু ইঁহাকে কেহ কখনও মেস-মেরাইজ করেন নাই,—তিনি আপনা হইতেই এই শক্তিলাভ করিয়া-ছিলেন।

একদিন তিনি আমাদের চক্রে চোখ বুঁজিয়া বসিয়াছিলেন ; একটু পরে আমার পিতামহীকে বলিলেন—"জেঠিমা, এখানে একজনকে দেখিতেছি ; তিনি বলিতেছেন, তিনি তোমার বাবা।" তাঁহার চেহারা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায়, শশীমুখী তাঁহার চেহারা যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে ঠাকুরমা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতা ভিন্ন অপর

ব্রহ্মবিদ্যা—১৩৪২ পৌষ

কেহ নহেন। অবশ্য শশীমুখী তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় কখনও দেখেন নাই; আর আমাদের বাড়ীতেও কখন আসেন নাই। তবুও সন্দেহ একেবারে দূর করিবার জন্য, ঠাকুরমা শশীমুখীকে এরূপ কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা তাঁহার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবার পর, তিনি যে ঠাকুরমার পিতা তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

শশীমুখী ছিলেন অতি সরল স্বভাবা। লেখাপড়া তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না। তাঁহার ন্যায় সাদাসিদা গো-বেচারার পক্ষে মন-গড়া কোন কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই তিনি চক্ষু বুজিয়া দেখিতেছেন বলিয়া যাহা বর্ণনা করিতেন, তাহা কল্পনা করিয়া বলিবার শক্তি তাঁহার আদপেই ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার দিব্যদৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল, তখন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীর কিংবা অপর কোন মৃত ব্যক্তির দর্শন পান নাই।"[১]

২। শ্লেট লিখন— এই শ্লেট লিখন স্বয়ং প্রেতাত্মা দ্বারা সম্ভব হতে পারে কিংবা মিডিয়মের হাতে ভর করেও লিখন ক্রিয়া হতে পারে। শ্লেট লিখনও আলাপাদি করবার একটি মাধ্যম। এবিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে লিখেছেন—"এই সভায় অনেক মিডিয়ম উপস্থিত ছিলেন। এদের কেউ কেউ আমায় বলে-ছিলেন—"আমি যে সব কথা তাঁদের বলেছি সে-সব তাঁরা তাঁদের এক উপবেশনে যাবার জন্য আমায় আমন্ত্রণ করলেন। ১৮৯৯-এর ৪ঠা আগষ্ট এক উপবেশনে থেকে একটা টাইপ-রাইটারে আপনা-আপনি টাইপ-রাইটিং হতে দেখলুম। সকলেই আপন আপন মৃত আত্মীয়-বন্ধুদের নাম দিবেন। আমিও আমার গুরুভাই যোগেনের নাম দিলুম;

১। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ প্রণীত "পরলোকের কথা"

নীল পেন্সিলে লেখা যোগেনের নাম পাওয়া গেল। এতে আমার কৌতূহল জাগলো ; কে লিখলেন আমার জানতে ইচ্ছা হল।"[১]

এরপর তিনি পরদিন সকালে স্বয়ং শ্লেট লিখনের প্রখ্যাত মিডিয়ম মির কিলারের সঙ্গে দেখা করেন এবং চক্রে বসেন। তারপর বিশেষ নিয়মে অর্থাৎ কিলার সাহেবের নির্দেশমত টেবিলের উপর শ্লেট ধারণ করেন। শ্লেটের উপর সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরাজী, বাঙলা ভাষায় লেখা পাওয়া গেল। তিনি পরের চক্রে জানতে পেরেছিলেন— যোগানন্দজী গ্রীক দার্শনিকের প্রেতাত্মা সঙ্গে এনেছিলেন। তিনিই প্লেটোর একটি কবিতার অংশ লিখে দিয়েছিলেন।"

"২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১২টা সময় মিডিয়মকে লইয়া অমৃতলাল আর আমি চক্রে বসিয়াছিলাম। আমরা একখানি পরিষ্কার শ্লেট আনিয়া মিডিয়মের হাতে দিলাম। তিনি শ্লেটখানি এক টুকরা পেন্সিল সহ টেবিলের নিম্নদেশে চাপিয়া ধরিলেন। আমরা তিনজন এই টেবিলের তিনদিকে বসিবার পর, অমৃতলাল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্ন করিবামাত্র শ্লেটের উপর ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। শব্দ আসিবামাত্র শ্লেট তুলিয়া দেখা গেল উহাতে প্রশ্নের সঠিক উত্তর লেখা আছে। এই প্রশ্নোত্তর কাগজে লিখিয়া লইয়া শ্লেটখানি পরিষ্কার করিয়া, আবার টেবিলের নিচে ধরা হইল। এইপ্রকারে যে কয়েকটি উত্তর পাওয়া গিয়েছিল তাহা প্রশ্নসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অমৃত—আমি কি মিডিয়ম ?

উত্তর—হ্যাঁ।

অ—এগ্‌লিণ্টন সাহেব যে ভাবে আমার সহিত কথাবার্তা বলেন আমি সেরূপ পারি না কেন ?

উ—আপনি সেরূপ শক্তিধর হন নাই বলিয়া।

১। মরণের পারে পৃষ্ঠা—১৩১

অ—পরলোকগত নিজ জনের সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা কি ঠিক, না আমার নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত ?

উ—সেগুলি ঠিক, মস্তিষ্কপ্রসূত নহে।

অ—আমার মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের আত্মা কি এখানে উপস্থিত আছেন ?

উ—হাঁ, আছেন।

অ—আমার মাতা ও স্ত্রী কি একই স্তরে আছেন ?

উ—না,—আপনার মাতা পঞ্চম স্তরে এবং আপনার স্ত্রী চতুর্থ স্তরে আছেন।"[১]

(৩) প্লানচেট লিখন ঃ—(Planchette writing)

ইহা ত্রিকোণা কাষ্ঠের একটি ফ্রেম। ঐ ত্রিকোণা ফ্রেম বা ত্রিচক্রাকার কাষ্ঠ খণ্ডের দুই দিকে দুটি চাকা সংযোগ করা থাকে, আর একদিকে ছিদ্র করে একটি পেনসিল শক্তভাবে আঁটা থাকে। চক্রে বসে যথানিয়মে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় এবং প্ল্যানচেট যন্ত্রটি সম্মুখ-ভাগে স্থাপন করতে হয়। ঐ যন্ত্রটির যে দিকে চাকা লাগান আছে সেইদিকে হালকা ভাবে হাতের আঙ্গুল স্পর্শ করে রাখতে হয়। খুব হালকা ভাবে ধরতে হয়। প্রেতাত্মা ঐ হাতের ওপর ভর করে করে লিখতে থাকে। ইহা মিডিয়মের এক অঙ্গের ওপর আবেশ হয় বলে মিডিয়ম সম্পূর্ণ আবিষ্ট হয় না।

"হেমন্ত বাবুর ওপর আত্মার আবির্ভাব হইলে সেরূপ কিছুই প্রকাশ পাইত না, তিনি কোন আত্মা কর্তৃক যে আবিষ্ট হইয়াছেন তাহাও তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বোঝা যাইত না ;—তিনি ধীর ও স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতেন, কেবলমাত্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি মৃদু মৃদু কাঁপিত। তখন তিনি পেন্সিল লইয়া কাগজের ওপর অনর্গল লিখিয়া

১। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ প্রণীত "পরলোকের কথা"

যাইতেন। অনেক সময় এরূপ দ্রুতগতিতে লিখিতেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখা হইয়া যাইত।"

(৪) শব্দ সাহায্যে (By Rappings)

শব্দ সাহায্যে প্রেতাত্মার সহিত কথা বলা যায়। শব্দ মানে এখানে বাক্য উচ্চারণ নহে। টেলিগ্রাম যন্ত্রের টরেটক্কা শব্দাঘাতের ন্যায়। 'হাঁ' উত্তর হলে একটি শব্দ, 'না' হলে দু'টি শব্দ বা কিছু না হলে তিনটি টক্ টক্ টক্ শব্দ করার রীতি থাকে। এই শব্দাঘাতের সংখ্যা অনুযায়ী প্রশ্নে উত্তর পাওয়া যায়। তাছাড়া বাক্য বলতে হলে তখন অ আ ই প্রভৃতি বর্ণগুলি উচ্চারণ করে যেতে হবে, যে অক্ষর উত্তর হবে ঠিক সেই অক্ষর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মা শব্দাঘাত করে জানিয়ে দেবে ঐ শব্দটি হবে। পরে আবার মিডিয়ম অ আ হতে বর্ণ উচ্চারণ আরম্ভ করলে যে অক্ষর হবে সেখানে শব্দ হবে—এইভাবে বর্ণগুলি সাজিয়ে উত্তরস্বরূপ বাক্য পাওয়া যাবে। এইভাবে উত্তর আদানপ্রদান হয়।

(৫) আরোগ্যকারী মিডিয়ম (Healing Medium)

সেবা কর্ম সম্পাদনকারী প্রেতাত্মারা মিডিয়মের সাহায্যে মানুষের অনেক সেবা করে থাকে। এই জাতীয় মিডিয়ম গ্রামে গঞ্জে এখনও বহু। যাকে আমরা ভর হওয়া বলি তাই Healing Medium। বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্র বার ও দিনে এই মিডিয়মদের উপর ভর হয়। ভরের সময় সমাগত ব্যক্তিদের নানা সমস্যার সমাধানকল্পে উক্ত আবিষ্ট অবস্থায় উত্তরাদি প্রদান করেন। অসুখ, মামলা, বিচ্ছেদ, অশান্তি, হারান দ্রব্য প্রপ্তি, প্রভৃতি এই ধরণের বহু সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দেন ঐ প্রেতাত্মারা।

(৬) ভৌতিক দেহ ধারণ—

প্রেতাত্মারা স্থূলরূপে আত্মপ্রকাশ করতে বহু পরিশ্রম করতে হয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অংশ দ্বারা সূক্ষ্মদেহ

গঠিত। সেজন্য পঞ্চভৌতিক অণুপরমাণুগুলি যথা নিয়মে ঘনীভূত না করতে পারলে স্থূলদেহ তৈরী হতে পারে না। সেজন্য বেশীর ভাগ প্রেতাত্মা হয় গন্ধকে, আলোকে, শব্দকে অবলম্বন করে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। উন্নত, দেবভাবাপন্ন আকার আবির্ভাব হলে দিব্যগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়, দিব্যশব্দাদি শোনা যায়। তেমনি আবার নিম্নজাতীয় প্রেতাত্মার আগমন হলে দুর্গন্ধাদি পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া প্রেতাত্মাদের দেহধারণের জন্য মিডিয়মের দেহ হতে একপ্রকার এক্টোপ্লাজম্ সাহায্য করে। ইহা তরল, স্বচ্ছ একপ্রকার পদার্থ। মিডিয়মের দেহ হতে এইগুলি প্রেতাত্মা গ্রহণ করে তার দেহ গঠন করতে পারে।

ভৌতিকদেহ ও ভৌতিক অস্তিত্ব

ভৌতিকদেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হ'তে তৈরী। একে তন্মাত্র দিয়ে তৈরীও বলা যায়। পঞ্চভূতের যে কোন একটিকে অবলম্বন করেও ভৌতিকদেহের অবতরণ হতে পারে বা প্রকাশ হতে পারে। যেমন শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি একটি গুণে অনুরঞ্জিত হয়ে ভৌতিকদেহের অবতরণ হ'তে দেখা গিয়েছে।

ভৌতিক অস্তিত্বের কথা অনেকে স্বীকার করেন, অনেকে আবার স্বীকার করেন না। এগুলি মানুষের কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞতা মাত্র বুঝতে হবে। সে বিষয়ে যার জ্ঞান নাই সে অন্য বিষয়কে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। অনেকে আছেন—যাঁরা, নিজের যে বিষয়ে জ্ঞান নাই বলে সেটি অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করেন না অনেকের কথা স্বীকার করে নেন।

অনেকে রাত্রিতে অন্ধকার স্থানে ভৌতিক অস্তিত্বের পরিচয় পেয়ে থাকেন। তাঁরা যখন সেই ভৌতিক কথা অন্যকে বলেন তখন কেহ কেহ স্বীকার করেন কেহ বা করেন না। যাই হোক্ বর্তমানে পরাবিদ্যা সমিতি এবং প্রেতানুসন্ধান সমিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভৌতিক-রহস্যের বিবিধ ঘটনা প্রমাণিত এবং প্রচারিত হওয়ায় বহু শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। পরাবিদ্যা সমিতির বৈঠকে যোগদানকারী ব্যক্তিরা বলেন—আমরা স্থূলদেহেই সূক্ষ্মজগতের খবরাদি জানতে পারি এবং এমন কি সূক্ষ্মজগতের লোকজনকেও এই লোকে নামিয়ে এনে আলাপালোচনা করা সম্ভব হতে পারে।

মিডিয়মের মাধ্যমে প্রেতাত্মা আনয়নের অনেক বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পুস্তিকাতে পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি মিডিয়মে আবিষ্ট হ'য়ে উত্তরাদি দেন তা না হতেও পারে। সেজন্য মিডিয়মের কথাবার্তা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক না হ'তেও পারে আবার ঠিক

হতেও পারে। তবে ভৌতিক ব্যক্তি দ্বারা মিডিয়ম পরিচালিত হ'য়ে কাজ করেন এটা সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

ভৌতিক 'গালগল্প' আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু শুনেছি। অনেকে বই-এ পড়েছি। অনেক ক্ষেত্রে ভৌতিক গল্পকে অদ্ভুতভাবে, অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলাও হ'য়ে থাকে। কারণ ভৌতিক ব্যাপারটিই হ'ল রহস্যময় সাধারণ জগৎ বা লোক হ'তে এক স্বতন্ত্র ব্যাপার।

ভৌতিক কাণ্ড এমনি যে, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ ঘরের মধ্যে বিকট চিৎকার হ'তে আরম্ভ হ'ল। এমনি শব্দ শ্রবণ করে দুর্বল ভীরু মানুষ হয়ত মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়ে বা জীবনহানিও ঘটতে পারে।

অনেকের দেহকে অবলম্বন করে 'প্রেতাত্মা' কাজ-কারবার করে। ভাল অভিজ্ঞ 'ওঝা' বা গুরুরা প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রেতাত্মাকে তাড়িয়ে দিয়ে মানুষটিকে বাঁচিয়ে তোলেন।

হিন্দুরা জন্মান্তর স্বীকার করে। বহু জন্মের সঞ্চিত কর্মফলের পরিসরগুলি ভোগ করতেই হয়। কারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ করলে সেও যে একদিন না একদিন আমাকে হিংসাদি করবেই জেনে রাখতে হবে। এজগতে কোন কিছুরই ধ্বংস নাই, লয়-ক্ষয় নাই। মানুষের মনের অনন্ত কামনা-বাসনাও সূক্ষ্মভাবে সঞ্চিত থাকে। সেগুলি ধীরে ধীরে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। কাজেই কারো প্রতি অন্যায়ভাবে হিংসা ক্রোধ করলে, হত্যা করলে সেও জন্মান্তরে তার প্রতিশোধ যে নিয়ে থাকে তার অনেক ঘটনা জানতে পারা গিয়েছে। এমন কি হত-ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলে দিয়েছেন—তার মৃতদেহ কোথায় প্রোথিত আছে, কে হত্যা করেছে, কেন হত্যা করেছে প্রভৃতি স্পষ্ট সত্য ঘটনা। কারণ পরে সেই কথামত খোঁজখবর করে দেখা গিয়েছে প্রকৃতই সেই সমস্তই সত্য। তাছাড়াও বলেছে সেই হত্যাকারী ব্যক্তির পরিণাম কি হবে তাও সত্য হতে দেখা গিয়েছে।

মৃত্যুর সময় অনেকে মৃতব্যক্তির আগমন দর্শন করে থাকেন। বা অপরিচিত ব্যক্তিদেরও আগমন দর্শন করে থাকেন। কারণ মুমূর্ষু সময় পরলোকগত ব্যক্তিরা তাঁকে সঙ্গে করে তাঁদের স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেজন্য মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির আসে-পাশে তারা এসে ঘোরাফেরা করতে থাকে। কেহ কেহ দেখতে পান কেহ কেহ বা দেখতে পনে না। মুমূর্ষু ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার শিথিল ও মুক্ত হয়ে যাওয়ায় সে সূক্ষ্মের অনেক দৃশ্যই দেখতে পায় কিন্তু বলবান ব্যক্তিরা তা দেখতে পায় না। এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তাঁর সন্তানকে বললেন —'আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার দুই পাশে দুইজন দণ্ডায়মান রয়েছে। তোমরা আমাকে ধরে থাক নচেৎ আমার ভীষণ ভয় করছে।' পুত্র তাকে স্পর্শ করে থাকায় তারা সেই ব্যক্তিকে আর স্পর্শ করতে পারে নাই। মৃতদেহ স্পর্শ করে থাকা আমাদের দেশে এক প্রচলিত নিয়মই আছে। কেন এই স্পর্শ করার নিয়ম? অন্য সূক্ষ্মাত্মা যাতে তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্যই এমনি ব্যবস্থা। কাশীর মহা-মহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এক বালক সাধুকে একদিন দর্শন করতে গিয়েছিলেন। বালক সাধুটির নাম কেদারনাথ। জাতিতে মালাকার। বালকটি ৩/৪ দিন ধরে অচৈতন্যভাবে পড়ে থাকত। তাঁর বাবা-মা কত ডাক্তার ঔষধপত্র করেছেন। কিন্তু কিছুতেই পুত্রের সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নাই। কিন্তু বালকটি স্পষ্ট বলতো আমার কোন রোগ হয় নাই। আমাকে নিতে লোক আসে তাহাদের সঙ্গে আমি এই দেহ ছেড়ে চলে যাই। পিতামাতা এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না বলে, মনে করতেন ভূতে হয়তো পেয়েছে। তাই ডাক্তার কবিরাজ ওঝা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেও কিছু করতে পারতেন না। এক-দিন কবিরাজ মহাশয় ঐ বালককে দেখতে গিয়ে দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর দেহে ফিরে এলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানলেন যে ঐ বালক লোকান্তরে চলে যান। বিষ্ণুলোক শিবলোক

প্রভৃতির বিবরণ বালক দিতে পারতেন এবং বালকটি তাঁর পিতামাতাকে বলতেন—দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহটি যেন স্পর্শ করে থাকে কেউ। একদিন কোন কারণে দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ায় অসৎ-আত্মা ঐ দেহে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে, ঠিক সেই সময়ই কেদারনাথ দেহে ফিরে আসায় আর দেহে অসৎ আত্মা প্রবেশ করতে পারে নাই।

কাজেই এটা ঠিক যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহের ওপর লোকান্তর আত্মার একটা দৃষ্টি থাকেই। সৎলোকদের সঙ্গে সৎ আত্মার যোগাযোগ হয়, অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে অসৎ আত্মার যোগাযোগ হয়ে থাকে। সৎ ধার্মিক ব্যক্তিরা মৃত্যুর সময় শ্রীগুরুদেবের দর্শন বা দেবতা দর্শন করে থাকেন। এই প্রকার দর্শন হয়ে থাকলে জানতে হবে জীবাত্মার উর্ধ্ব-গতি অবশ্যম্ভাবী। আর বিকট, কদাকার, কিম্ভূতকিমাকার ব্যক্তিদের দর্শন হ'লে জানতে হবে নিম্নগতি, নরকভোগ অবধারিত।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিষ্ণুদূত, শিবদূত, যমদূত প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি ব্যক্তির কর্মফলানুযায়ী যে লোকে গতি হবে সেই লোকের দূতেরাই তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসে থাকে বা নিয়ে যায়ও। রাবণের মৃত্যুর সময় যমদূত এবং বিষ্ণুদূত দুই-ই এসে হাজির হয়। কিন্তু রাবণ ছিলেন মহা তেজস্বী পুরুষ তাই দুই পক্ষের দূতেরাই তাঁর সন্নিকটে যেতে ভীত। কাজেই দেখা যায় লোকোত্তর আত্মার অবতরণ ও উত্তরণ অবশ্য স্বীকার্য।

আগেই বলেছি ভৌতিক কাণ্ড অনেকে বিশ্বাস করেন কেহ বা বিশ্বাস করেন না। কানাইলাল নাগ মহাশয় তাঁর পরলোক তত্ত্ব গ্রন্থে ভূতের খেলা বলতে গিয়ে একস্থানে একটি ভাল ঘটনার অবতারণা করে দেখিয়েছেন। সংক্ষেপে তা হ'ল—তিনি একদা মালদহের একস্থানে কার্যরত ছিলেন। সেখানে তিনি বহু ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করে পরিচিত হন। কার্যের পর অনেকে মিলে একস্থানে ধর্মালোচনা হত বহুরাত্রি পর্যন্ত। একদিন হঠাৎ ঐ আলোচনা সভায় এক ওঝা

উপস্থিত হন। ঐ সভায় সাবরেজিষ্টার সাহেবও ছিলেন। সাবরেজিষ্টার সাহেব ওঝাকে বললেন—'আপনারা ভূতপ্রেত বলে ভয় দেখিয়ে লোকের কাছ হতে অন্যায়ভাবে টাকা রোজগার করেন।' ওঝা বললেন—'ভূত-প্রেত সমস্তই সত্য।' তা হ'লে আমাকে দেখাতে পারেন? —সাহেব বললেন। ওঝা বললেন সন্ধ্যার পর অমুক স্থানে আমি থাকব সেখানে আপনি যাবেন আমি ভূত দেখিয়ে দেব। সাহেব ও আরো কয়েকজন মিলে সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বসলেন। ওঝা আগেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধ্যার পর দেখলেন মাঠে শ্রেণীতে শ্রেণীতে আলোর আবির্ভাব হ'ল। ওঝা বললেন এক একটি আলো এক একটি ভূত। সকলেই তা দর্শন করে বাড়ী ফিরে এলেন।

আরেকটি ঘটনার অবতারণা করেছেন নাগ মহাশয়। এক ভদ্রলোকের এক পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ভদ্রলোক পুত্রকে নিয়ে কলিকাতায় এক ভাড়া বাড়ীতে রেখে চিকিৎসাদি করতে থাকেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। একদিন ভদ্রলোকের স্ত্রী রান্না করে রান্নাঘর হতে খাওয়ার ঘরে যাওয়ার পথে দেখলেন এক অপরিচিত ব্যক্তি দণ্ডায়মান। তাঁকে সরে যেতে বললেন রাস্তা হতে কিন্তু ঐ ব্যক্তি কিছুতেই রাস্তা ছাড়েন না। তখন ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে ডাকলেন। স্বামীও এসে তাঁকে দেখতে পেলেন এবং সরে যেতে বললেন, তবু কথা শুনে না। কিছুক্ষণ পরে ঐ মূর্তি বললেন—'আমি ১০৷১২ বৎসর যাবৎ এখানে আছি। এখন তোমরা আসায় আমার অসুবিধা হচ্ছে। তোমরা তিনদিনের মধ্যে এ ঘর ছেড়ে না গেলে তোমাদের পুত্রকে মেরে ফেলব।' তখন স্বামী স্ত্রী ২৷৩ দিনের মধ্যে ঘর ত্যাগ করবেন বললেন, অমনি ঐ প্রেতমূর্তি অদৃশ্য হলেন।

এমনি অসংখ্য ভৌতিক ঘটনা পুস্তক পত্রিকাদিতে ছড়িয়ে আছে। প্রেতযোনি বা ভূতযোনিকে অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত ভূতযোনি বা প্রেতযোনিদের মধ্যে আবার শ্রেণীভেদ আছে—যেমন

নাকি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, জ্ঞান গুণের ভেদ আছে। এই সমস্ত ভূতযোনি অনেক সময় মানুষের উপকার করে আবার ক্ষতিও করতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে। এই প্রসঙ্গে কানাইলাল নাগ তাঁর পরলোকতত্ত্ব পুস্তকে একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। বর্ধমান জেলার রামনারায়ণপুর গ্রামের এক বাড়ীতে পিতৃদেব মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও প্রেতদেহে ঘর পাহারা দিতেন। তাঁহার সন্তানেরা রাত্রিতে কোন কারণে বাইরে বের হলেই তাঁদের পিতৃদেবকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখতে পেতেন। মৃত পিতৃদেব স্পষ্ট বলতেন—'আমাকে দেখে তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট করব না, বরং তোমাদের ভালই করব।' এই কথা অন্যান্য ভাইদেরও জানাল সে। সকলে মিলে স্থির করলেন একসঙ্গে একবার দর্শন করবেন এবং এখানে প্রেতরূপে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসাও করবেন। আবার একদিন রাত্রে দেখামাত্র সকলে মিলে মৃত পিতৃ-প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কেন এখানে এখনও আছেন। প্রেতাত্মা উত্তরে বলেন—আমি দিনে তোমাদের খান ঘরে থাকি আর রাত্রে বারান্দায়। তোমাদের কোন অনিষ্টই করি না। যদি তোমরা ভয় কর তবে আমি ছয় মাস পরে চলে যাব। তবে তিন মাস পরে তোমাদের ঘোর বিপদ ঘটবে। জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে ফৌজদারী মামলা হবে এবং গ্রামের সমস্ত লোক তোমাদের বিপক্ষ হবে, কেবল তোমাদের আব্দুল চাচা তোমাদের পক্ষে থাকবে। সেই সময় আমি না থাকলে তোমাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। তাই অপেক্ষা করছি।' এই কথা শুনে ভ্রাতারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বিশ্রাম করতে গেল। তিন মাস পরে সত্যসত্যই মামলা-মোকোদ্দমা হয়। প্রতিদিন ঐ পিতৃ প্রেতাত্মা রাত্রে বাড়ী ও বাগান পাহারা দিতেন। একদিন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঘুম হতে তুলে বললেন যে, 'চোর গাছের কাঁঠাল চুরি করতে এসেছিল, আমি গাছে বেঁধে রেখে এসেছি। তুমি গিয়ে যাহা হয় ব্যবস্থা কর। পুত্র গিয়ে

দেখেন ঠিকই চোর গাছে বাঁধা আছে। তখন কাঁঠাল নিয়া চোরকে শাস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এইভাবে পিতৃ প্রেতাত্মা তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতেন। একদিন তিনি স্পষ্ট সন্তানদের বললেন আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি এখন পরলোকে চলে যাচ্ছি। তোমরা মসজিদে গিয়ে ভগবানের কাছে আমার মঙ্গল প্রার্থনা করো। সন্তানেরা পিতার কথামত তা করেন। তারপর হতে আর কোনদিন পিতৃ-প্রেতাত্মাকে দেখা যায় নাই।

এইভাবে প্রেতাত্মার মধ্যেও স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা বিদ্যমান থাকতে দেখতে পাওয়া যায়। ইহজীবনে যেমন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে মানুষ, পরলোকেও তার ক্রিয়া হয়। আকাঙ্ক্ষা, আসক্তিই মানুষকে এই সংসার চক্রে বারবার ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে, বারবার জন্মমৃত্যু ঘটাচ্ছে। তবে সব ক্ষেত্রেই যে একরকম হবে তার কোনই মানে নাই। যাঁরা সংসার মায়া মমতাকে ইহজীবনে কাটাতে পেরেছেন তাঁরা মৃত্যুর পর কর্মফলানুসারে ঊর্ধলোকে স্থিত হন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভূতযোনি নিম্নযোনিকে বোঝায়। এক রকমের ভূতযোনি আছে তাদেরকে ইতরযোনি বলে। এই ইতরযোনির প্রাণীদের একটা বংশ আছে। তাদের জন্ম মৃত্যু হয়। এরা পঞ্চভূতের কোন না কোন একটা ভূতকে অবলম্বন করে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন হঠাৎ একটা ঝড় বয়ে গেল বা দুর্গন্ধের মত বাতাস প্রবাহিত হ'ল এগুলি বায়ুরূপী হয়ে ভূতের আত্মপ্রকাশ। এগুলিও ভূতযোনি।

"এক সময় ঠাকুর (রামকৃষ্ণদেব) একদিন শ্রীযুত রাখালকে (ব্রহ্মানন্দ স্বামী) সঙ্গে লইয়া কামারহাটিতে গোপালের মার নিকট আসিয়া উপস্থিত—বেলা দশটা আন্দাজ হইবে। কারণ গোপালের মার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল, নিজ হস্তে ভাল করিয়া রন্ধন করিয়া একদিন ঠাকুরকে খাওয়ান। বুড়ীতো ঠাকুরকে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। যাহা যোগাড় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই জলযোগের

জন্য দিয়া জল খাওয়াইয়া বাবুদের বৈঠকখানার ঘরে ভাল করিয়া বিছানা পাতিয়া তাঁহাদের বসাইয়া নিজে কোমর বাঁধিয়া রাঁধিতে গেলেন। ভিক্ষা-সিক্ষা করিয়া ভাল ভাল জিনিস যোগাড় করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার রান্না করিয়া মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে বেশ করিয়া খাওয়াইলেন এবং বিশ্রামের জন্য মেয়ে মহলের দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরখানিতে আপনার লেপখানি পাতিয়া ধোপদরস্ত চাদর একখানি তাহার উপর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানা করিয়া দিলেন। ঠাকুরও তাহাতে শয়ন করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালও ঠাকুরের পার্শ্বেই শয়ন করিলেন, কারণ রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ঠাকুর ঠিক নিজের সন্তানের মত দেখিতেন এবং তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারও সর্বদা করিতেন।

এই সময় ঐ স্থানে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঠাকুর দেখেন। তাঁহার নিজের মুখ হইতে শোনা বলিয়াই তাহা আমার এখানে বলিতে সাহসী হইতেছি, নতুবা ঐ কথা চাপিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। ঠাকুরের দিনে রাতে নিদ্রা অল্পই হইত, কাজেই তিনি স্থির হইয়া শুইয়া আছেন, আর রাখাল মহারাজ তাঁহার পার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় ঠাকুর বলেন—"একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো; তারপর দেখি ঘরের কোণে দুটো মূর্তি। বিট্‌কেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে নাড়ীভুঁড়িগুলি ঝুলচে, আর মুখ, হাত-পা মেডিকেল কলেজে যেমন একবার মানুষের হাড়-গোড় সাজান দেখেছিলাম (মানব-অস্থিকঙ্কাল) ঠিক সেইরকম। তারা আমায় অনুরোধ করে বলচে, 'আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের (নিজেদের অবস্থার কথা মনে পড়ে বোধ হয়।) বড় কষ্ট হচ্ছে।' এদিকে তারা কাকুতি—মিনতি কচ্চে, ও দিকে রাখাল ঘুমুচ্চে। তাদের কষ্ট হচ্ছে দেখে বেটুয়া ও গামছাখানা নিয়ে চলে আসবার জন্য উঠচি এমন সময় রাখাল জেগে বলে উঠলো, 'ওগো তুমি কোথায় যাও?'

আমি তাকে 'পরে সব বলবো' বলে তার হাত ধরে নীচে নেমে এলাম ও বুড়ীকে (তার তখন খাওয়া হয়েছে মাত্র) বলে নৌকায় গিয়ে উঠলাম। তখন রাখালকে সব বলি—ঐখানে দুটো ভূত আছে! বাগানের পাশেই কামারহাটির কল—ঐ কলের সাহেবরা খানা খেয়ে হাড়গোড়গুলো যা ফেলে দেয় তাই শোঁকে (কারণ ঘ্রাণ লওয়াই উহাদের ভোজন করা!) ওরা ঐ ঘরে থাকে। বুড়ীকে ও-কথার কিছু বললুম না—তাকে ঐ বাড়ীতেই সদা সর্বক্ষণ একলা থাকতে হয়—ভয় পাবে।

কুলদানন্দ মহারাজ তাঁর 'সদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থে স্বয়ং প্রেতের উপদ্রব সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তারই সংক্ষেপ হ'ল—হাসপাতালে রাত্রে নাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন, যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় তখনই কে যেন খাটিয়া খানা শুদ্ধ ঝাঁকাইয়া দিত। তখন পা হতে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে থাকত। এই কথা একদিন তাঁর দাদাকে বলায় দাদা বললেন হাসপাতালের ঐ খাটে এক রোগী মারা যায়। তারপর হতে সেই খাটে যে থাকে তাকেই সেই প্রেতাত্মা ভয় দেখায়। প্রেত স্পষ্ট বলে—'তু হামারা বিস্তারা পর কাঁহে লোটা তোহারা জান লেএঙ্গে।' এমনি কথা বলে প্রেতটি রোগীদের ভয়ভীতি দেখায়। একদিন এক সাহসী রোগীকে সেই খাটে থাকতে দেওয়া হয়। পরের দিন রোগীকে জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে, 'আমি আর এখানে থাকব না, আমাকে কৃপা করে ছেড়ে দিন।' রোগীকে আরো ভাল সেবা যত্নের ব্যবস্থা করে দেওয়া হ'ল এবং রাত্রে আবার থাকতে বলা হ'ল। রাত্রে দেখা গেল সে খাটিয়া হতে নেমে নীচে বসে রাত কাটাচ্ছে। পরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রোগী বললেন—'বাবু সাব! সেলাম। আব তো হাম চলতি।' রোগীকে জোর করে থাকতে বলায় সে খুব উত্তেজিত ভাবে বলে—'জাহান দেএঙ্গে ক্যা? নিত্ রাতসে শালা জিন আয়কে হামারা ছাতিপর বৈঠতা আউর মারপিট কর্‌তা। বোল্‌তা

তোহারা জান্ লেএঙ্গে। খাটিয়া ছোড়্ দে।' হাম সারা রাত ইহাঁ নিচু মে বৈঠ্ রয়্তে। মই তো কভি নেঁহি রহঙ্গে।'

এরপর ডাক্তার সাহেব ঐ খাটিয়া নদীতে ফেলে দেন। ইহা ছাড়াও 'শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের লৌকিক বিদ্যা ও অলৌকিক শক্তি' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রেতাত্মার সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। ঢাকার এক গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর আছেন। সেখান হতে সদলবলে জয়দেবপুর যাওয়া ঠিক হয়। ঠাকুর সকলে মিলে সন্ধ্যেবেলায় বের হলেন। রাস্তায় এক ডাকবাংলোয় রাত্রিটা থাকা ঠিক করলেন। ডাকবাংলোয় গিয়ে সকলে পেঁাছান। রাস্তায় কেহ কেহ বললেন—রাত্রে ঐ ডাকবাংলোয় থাকবেন না। ঠাকুর কোন কথা না শুনে সেখানেই সকলকে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন। রাত্রে সকলে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখা গেল বন্ধ করা দরজা-জানালাগুলি হঠাৎ খুলে গেল। ঠক্ ঠক্ শব্দ হতে লাগল। ঠাকুর বললেন—এ কিরে? কি হচ্ছে? অন্য সকলে প্রথম মনে করে বাতাসে বোধহয় সব খুলে গেল। তাই আবার বন্ধ করে সকলে শুয়ে পড়ল। এইবার সকলের বিছানা ধরে টানাটানি করতে লাগল ভূতেরা। সকলে মিলে ঠাকুরকে জানালে ঠাকুর তখন ভূতগুলিকে বলেন—"এই থাম্। দেখছিস্ না, আমার ছেলেরা শুয়ে আছে। তাদের কোন কিছু করিস না।" তারপর চিঁ চিঁ করে ওদের ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। এমন সময় ভয়ে এক শিষ্যের পেচ্ছাব এবং এক শিষ্যের পায়খানা পায়। ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর ভূতদের বলেন—"আমার ছেলেরা পেচ্ছাব, পায়খানা যাবে তোরা ওদের সঙ্গে যা, যাতে অন্য কিছুতে ভয় না পায়।" ওরা গেল কিন্তু শিষ্যদের অন্তরে ভয় লেগেই থাকল। এমনিভাবে রাত্রি কেটে গেল। ভোরবেলায় দূরের গ্রাম হতে বহু লোক দেখতে এল যে বোধহয় রাত্রে সকলে মারা গিয়েছে। ঠাকুর এবং দলবল সকলকে

তাঁরা দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বলল আপনাদের ঠাকুর নিশ্চয় মহাপুরুষ। ঠাকুর তাঁদের বললেন - "এখানে চারজন লোক মারা গিয়েছে তাদের পিণ্ড না দেওয়া পর্যন্ত মুক্ত হবে না।" মৃত্যুর সময় মানুষের অন্তরে কোন বাসনা জাগ্রত হ'লে তা সূক্ষ্ম শরীরে অনেকে পূরণ করে থাকেন। কারণ স্থূলদেহ যেখানে পৌঁছাতে অসমর্থ সেখানে মনোময় সূক্ষ্ম শরীর মুহূর্তে পৌঁছাতে মোটেই কষ্টভোগ করে না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসাত নিবাসী ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। একবার উভয়েই কলিকাতায় থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু উভয়ে লোক মারফৎ উভয়ের খবর নিতেন প্রতিদিন। একদিন হঠাৎ কালীকৃষ্ণবাবু অসুস্থ হয়ে বিছানায় শোয়া অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কালীকৃষ্ণ মহাশয় তাঁর স্ত্রীকে বললেন— 'বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে বসতে দাও।' তাঁর স্ত্রী বললেন কোথায় তোমার বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি বললেন — 'ঐ তো দাঁড়িয়ে!' কিন্তু তাঁর স্ত্রী তা দেখতে পেলেন না। কালীকৃষ্ণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করে বললেন তোমার অসুস্থ জীর্ণ শীর্ণ শরীর নিয়ে কেন কষ্ট করে এলে? এরপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলেন। পরে খবর পাওয়া যায় ঐ দিনই ঐ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগমন করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পরলোকে চলে যান তা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেখতে পান। সে দিনটি ছিল ১৪ই শ্রাবণ বুধবার ১২৯৮ সাল। গোস্বামীর পাশে বসে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী বাতাস করছেন। গোস্বামীজী হঠাৎ বলে উঠলেন—"আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর! হলুদ রং এর কত পতাকা উড়ছে! আহা! সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রং এর উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝলমল করছে। চারিদিকে

কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যা। দেবকন্যারা চামর নিয়ে ব্যজন করছেন, অপ্সরা সকল নৃত্য ও গান করছেন। আহা কত আনন্দ। আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া আকাশপথে সকলে আনন্দ করতে করতে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চললেন। হরি বোল, হরি বোল। গোঁসাইজী এই কথা বলতে বলতে চোখ বুজে সমাধিস্থ হলেন।

এরপর খবর পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগমন করেছেন। কাজেই সূক্ষ্ম শরীর অস্তিত্ব সাধারণ মানুষ হতে মহাপুরুষরা সকলেই প্রত্যক্ষ করে থাকেন। মহাপুরুষদের কাছে মুক্তির জন্য প্রেতাত্মারা এসে থাকেন। কারণ প্রেতদেহ লাভ হ'লে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। কর্মদোষে এই প্রেতদেহরূপ নিম্ন যোনি প্রাপ্তি মানেই হ'ল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝতে হবে। এই প্রেতদেহ হতে যাতে মুক্তি হয় তার জন্য প্রেতাত্মারা মহাপুরুষদের কাছে এসে নিজেদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন। বহু মহাপুরুষদের জীবনে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দুই একটি মাত্র প্রদর্শন করা হ'ল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী একবার তাঁর বাড়ী হতে কিছু দূরে একটি গ্রামে গান শুনতে গিয়েছিলেন। সেখানে গান শুনতে শুনতে অধিক রাত্রি হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েন। গান শেষ হয়ে গেলে সকলে চলে যায়, এদিকে গোস্বামীজীর মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গলে দেখেন কোথাও কেউ নাই—কেমন করে এই রাত্রিতে বাড়ী ফিরবেন? ঠিক সেই সময় একজন লোক লণ্ঠন হাতে এসে তাঁকে বাড়ীতে দিয়ে আসবেন জানালেন। গোস্বামীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?' লোকটি উত্তর দিল—তা কি তোমার দরকার। গোস্বামী বললেন—"মা বলেছেন এখানে অনেক ব্রহ্মদৈত্য আছে, উহারা মানুষের উপর অনেক অত্যাচার করে।" গোস্বামীজীর কোন ভয় হ'ল না। কাজেই তিনি বিনা দ্বিধায় ঐ লোকটির সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। রাস্তায়

যেতে যেতে লোকটি বলল—“এই পুরান ভিটার উপর দিয়া গেলে খুব কম সময়ে পৌঁছে যাব। তবে এই সময় গাছের উপর অনেক বানর বসে থাকে, তুমি যেন ভয় করো না।” ঠিক ঐ সময়ই গাছের উপর হতে কে যেন বলে উঠল—কি তুমি উহাকে মিথ্যা বুঝাচ্ছ? তখন ঐ প্রেতলোকটি তার প্রতিবাদে বলল—তোর এখনও শিক্ষা হয় নাই, যার জন্য তুই এখনও এত কষ্টভোগ করছিস? ভূতদের এইপ্রকার কথাবার্তা শুনে গোস্বামীজী ত' অবাক্। শেষে ঐ প্রেতলোকটি গোস্বামীজীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে একটি তাল গাছের উপর উঠে পড়ে। গোস্বামীজীর মাতৃদেবী ঐ প্রেতাত্মাকে দেখে চিনতে পারেন, তিনি বলেন ঐ প্রেতলোকটি হ'ল পুরন্দর পূজারী। বিগ্রহের জিনিসপত্র চুরি করার জন্য অধগতি হয়েছে। এই প্রেতাত্মারূপী পূজারী আরেক দিন গোস্বামীজীকে রক্ষা করেছিলেন। তারপর গোস্বামীজী গয়ায় গিয়ে বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন।

আরেকবার গোস্বামীজীর বাল্যকালের ঘটনা—কয়েকটি বন্ধুর কলেরা রোগে মৃত্যু হয়। তাতে তাঁর মনে খুব কষ্ট হয়। একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে ঐ বন্ধুগুলি দেখা দিয়ে গোস্বামীজীকে বলে, “দেখ ভাই, তুমি দুঃখ করো না, আমরা আছি।” গোস্বামী তখন ভয়ে ছুটে গিয়ে স্কুলের মাষ্টার মহাশয় ভগবান সরকারকে সব বলেন। মাষ্টার মহাশয় তখন দেখতে চান। গোস্বামীজী তখন ঐ স্থানে মাষ্টার মহাশয়কে নিয়ে এসে বন্ধুদের দেখা দিতে বলেন। কিন্তু কিছুতেই দেখা আর হয় না। মাষ্টার মহাশয় ক্রোধে তাঁকে প্রহার করবেন বলেন। তখন গোস্বামীজী মনের দুঃখে শেষবারের মত জোর গলায় বলেন, “বন্ধুগণ তোমরা আছো বলেছিলে কিন্তু দেখা না দিলে আমাকে মাষ্টার মহাশয়ের কাছে মার খেতে হবে।” সঙ্গে সঙ্গে মৃত বন্ধুদের আত্মা দেখা দিয়ে বলে উঠল—“মাষ্টার মহাশয়, উহাকে মারবেন না,

এই দেখুন আমরা আছি।" মাষ্টার মহাশয় তখন সূক্ষ্ম আত্মাগুলিকে দেখে বিস্মিত হলেন।

একবার ফয়জাবাদে এক ভক্তের বাড়ীতে গোস্বামীজী অবস্থান করছেন। একদিন পায়খানা গিয়ে ফিরতে খুব বিলম্ব হচ্ছে গোস্বামীজীর, ভক্তগণ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তারপর গোস্বামীজী ফিরলেন—দুর্গা দুর্গা বলে। বললেন, বাঁচলাম। কি উৎপাত রে?

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল? গোস্বামীজী বললেন—"বেলগাছে একটা ভূত ছিল। রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াল, যেতে দেবে না।" বলল—"আপনি এখানে আসবেন বলে বার বৎসর অপেক্ষা করছি, এখন আমার সংগতি করুন, নচেৎ রাস্তা ছাড়ছি না।" শেষে কান্নাকাটি করতে লাগায় কিছু ব্যবস্থা করে দিলাম। তারপর আমি নিস্তার পাই।

শ্রীবৃন্দাবনে এক বৈষ্ণবকে দেখে গোস্বামী-প্রভুর মনে সন্দেহ হয়। গোস্বামী-প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কে? তিনি উত্তর দেন আমি একটি প্রেত; একটি অপরাধের জন্য এই প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়েছি। গোস্বামীজী তাঁর অপরাধ জানতে চাইলে তিনি বলেন—"গোবিন্দের জিনিসপত্র অপহরণ করার জন্য এই অবস্থা হয়েছে। আপনি যদি দয়া করে আমার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়ে দেন তবে মুক্ত হই। গোস্বামীজী তার ব্যবস্থা করিয়ে দেওয়ায় তাকে আর দেখা যায় নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন ব্যারিষ্টার ছিলেন তখনকার অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি রাজদ্রোহীদের মামলা গ্রহণ করতে রাজি হন নি। একদিন দেশবন্ধু দেখলেন পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রেতাত্মা এসে ঐ মামলা গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তারপরই তিনি ঐ মামলা গ্রহণ করেন। তবে দেশবন্ধু প্রেতাত্মাকে বহু পরীক্ষা করে দেখে ঐ মামলা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বঙ্কিমবাবুর জীবনে প্রেতাত্মার দর্শন ঘটেছিল দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার নাগোরা মহকুমায় একবার তিনি রাজকার্যে গিয়েছিলেন। সেখানে রাত্রে বঙ্কিমবাবু নিজের ঘরে বসে পড়াশুনায় রত। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি দেখলেন এক অপরিচিত মহিলা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কেন এখানে এসেছ? ইত্যাদি। কিন্তু ঐ মহিলা কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পর ঐ মূর্তি বাইরে এসে ধীরে ধীরে বায়ুতে বিলীন হয়ে যায়। বঙ্কিমবাবু তারপরই ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সাউটিয়া গ্রামের সরকারী হাসপাতালের বর্তমান কার্যরত প্রধান চিকিৎসক মহাশয় ডাঃ অনাদিনন্দন নন্দ, এম. বি. বি. এস. তাঁর জীবনে কয়েকটি ভৌতিক অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে এক পত্রযোগে জানিয়েছেন—"ভূতপ্রেতে বিশ্বাস সকলেরই থাকে না। মাত্র যাঁরা ভূতপ্রেতের সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা বিশ্বাস না করে থাকতে পারেন না। মানুষ মরার পর কি ভূত হয়? এটা এক প্রশ্ন। সেজন্য আমি এখানে অনেকগুলির ঘটনা যাহা আমার জীবনে ঘটেছিল তার মধ্য হতে মাত্র তিনটি বর্ণনা করলাম। আশাকরি পাঠকরা এতদ্বারা প্রেতলোকে বিশ্বাসী হবেন।

গভীর অমাবস্যার রাত্রি। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর ষ্টেশনের অনতিদূরের জলেশ্বর বাজার হতে এক মাইল দূরে বিদ্যাধরপুর গ্রামে আমাকে যেতে হবে। রাস্তায় কোন লাইট নাই, সংকীর্ণ গলি রাস্তার দু'ধারে কাঁটার বেড়া। এমনি হাঁটতেই দেখলাম একটা ক্ষীণ আলোক আমার মাথার উপর দিয়ে আসতে লাগলো। এতে আমি বেশ পথ চলতে পারছিলাম। কিছু সময় পরে আমি আমার ভগ্নীপতি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাশের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিনিট, খাওয়া-দাওয়ার পরে দাদাবাবু, দিদি এবং আমি গল্প করতে লাগলাম। আমি অনেক দিন পর তাঁদের

গিয়েছি বলে তাঁরা আমাকে নিয়ে গতদিনের কত গল্প করতে লাগলেন। তখন রাত্রি প্রায় ২টা হবে। প্রায় একশত হাত দূরে এক ১০।১২ বৎসরের বালিকার ক্রন্দনের স্বর শুনিতে পাওয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলে ওঁরা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে প্রায় দু'বছর আগে সেখানে একটি মুসলমান মেয়ে (১০।১২ বছরের) মারা যাবার সময় এমনি কান্নাকাটি করেছিল। মৃত্যুর পরেও তাঁরা ঐ রকমের কান্নাকাটি দু-চারবার শুনেছিল। কিছু সময় পরে পাশের একটি জবাফুলের গাছ যেন ভেঙ্গে পড়বে এই রকম হ'ল। সেদিন ঐ কান্নাকাটি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে হয়েছিল। গলির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভৌতিক দেহধারী মেয়েটি কেঁদে কেঁদে যাওয়া-আসা করেছিল।

গ্রামের পশ্চিমদিকে আনন্দনগর আশ্রমের মাঠের দিকে আমি এবং ব্রজগোপাল মহাপাত্র দুজনেই বেড়ানোর জন্য বেরিয়ে গেলাম। হাতে একটি টর্চলাইট ছিল। আনন্দনগর আশ্রমের ঈশান কোণে দুই ফার্লং দূরে একটি নরমাহস্তি পুকুর আছে। ঐ পুকুরের ঈশান কোণে আমি বহিঃশৌচের জন্য গেলাম। ব্রজগোপাল পুকুরের অগ্নি কোণে দাঁড়িয়েছিল। আমি জলে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করছি, এমন সময় পুকুরের জলে একটি ঢেলা কে নিক্ষেপ করিল। ব্রজগোপাল দূরে দাঁড়িয়ে আছে, সে এত দূরে ঢেলা নিক্ষেপ করিতে পারে না। কিছু সময় পরে আমি পুকুরের উপরে চলে আসি। তখন আমার সামনে প্রায় ১ ফুটের মধ্যে চড়্ চড়্ পড়্ পড়্ শব্দ হইতে লাগিল। এমনি দু-তিনবার হ'ল। আমি আলো জ্বালাতেই সব বন্ধ। যাই হোক আমি ভয় না পেয়ে ব্রজগোপালের দিকে অগ্রসর হ'লাম। ব্রজগোপাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল কে ঐ রকম পুকুরে ঢেলা ছুঁড়েছিল। আমার সংশয়-এর কথাটা জানালাম। ব্রজগোপাল কোনদিন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না। কিছু সময় পরে আমরা ব্রজগোপালের বাড়ীর

দিকে চলিলাম। আমি পিছনে ছিলাম। তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় চণ্ডীমণ্ডপের কাছে একটা বিরাট কয়েৎবেল গাছের নিকটে আমি অনুভব করলাম যেন আমার মাথাটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং আমাকে নীচে ফেলে দেবে। তখনই আমি জয়গুরু জয়গুরু বলে নিজেকে সংযত করে নিলাম। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। আমরা তার বাড়ী পৌঁছালাম। তার পরের দিন ব্রজগোপালের ১০৪° F জ্বর হ'ল।

প্রেতাত্মা আশ্রয় গ্রহণের বিষয় নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। আমার আত্মীয় এক যুবকের অপঘাত মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর চার দিন পর তার বোনকে আশ্রয় করে কয়েকটি কথা বলেছিল। সন্ধ্যার সময়, আমি দোলাতে বসে আছি, এমন সময় সেই মেয়েটি চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানও হয়ে গেল, তারপর জ্ঞান ফিরে এলে কথা বলতে লাগল। তার দাদার কথা, যেমন—সে আবার ফিরে এসেছে, কার কাছে কত টাকা সে লুকিয়ে রেখেছিল, কার সঙ্গে তার কি গোপন কথা হয়েছিল, ঐ সব কথা সে বলতে লাগল। কিছু সময় পরে একজন গুণীন এসে ধমক-টমক এবং মন্ত্র বলতেই প্রেতাত্মা ছেড়ে পালাল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ঐ রকম ঘটনা হামেশা শোনা যায়। আমি ঐ ঘটনাটিও প্রত্যক্ষ করেছি।

স্বর্গলোক

এ পর্যন্ত নরক ও পাতালের বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করে আসা হয়েছে। এরপর ভূলোক হতে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সপ্তলোকের পরিসর এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিবরণ আমরা বিষ্ণুপুরাণেই পাই। সেখানে প্রথমেই ভূলোক বা পৃথিবীর আয়তনের কথা রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে চন্দ্র সূর্যের আলো যতদূর রাজ্য আলোকিত করে সেই পরিমাণ স্থানকেই বলে পৃথিবী।[১] আর পৃথিবীর পরিমণ্ডলের যেমন পরিমাপ ভুর্বলোকের পরিসরও সেই পরিমাণ। ভূমি হতে লক্ষ যোজন ব্যবধানে সূর্যদেব রয়েছেন। সেই সূর্যের আবার লক্ষ যোজন দূরত্বে রয়েছে চন্দ্র। চন্দ্রের লক্ষ যোজন দূরে নক্ষত্রমণ্ডল। নক্ষত্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন দূরে বুধ। এই বুধের দুই লক্ষ যোজন দূরে শুক্র। এমনি করে দুই লক্ষ যোজন দূরত্বে যথাক্রমে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি গ্রহ। এই শনি হতে এক লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে লক্ষ যোজন দূরে ধ্রুব। এইগুলি সমস্তই হ'ল ভূ ভুব, স্বর্লোকের অন্তর্গত। তারপর ধ্রুবলোকের উর্ধ্বে অর্থাৎ কোটী যোজন ব্যবধানে মহর্লোক। আর ধ্রুবলোকের দুই কোটী যোজন উর্ধ্বে জনলোক। এই জনলোকে সনক সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রেরা অবস্থান করেন। জনলোকের আট কোটী যোজন দূরত্বে তপোলোক। এই লোকে বৈরাজ নামক দেবগণ বাস করেন। জনলোক হতে বার কোটি যোজন দূরত্বে সত্যলোক। এই সত্যলোককে বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মালোক বলা হয়।

১। রবি-চন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাসতে।
সসমুদ্র-সরিচ্ছৈল্যা তাবতী পৃথিবী স্মৃতি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৭।৩

ভূলোক হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যে সপ্তলোক বা ভুবন পাওয়া যায় তাকেই সপ্ত স্বর্গ বলা হয়েছে তন্ত্রে।[১]

বিরাট পুরুষের আলোচনায় আমরা পেয়েছি পাদদেশ হতে কোটী পর্যন্ত যে পরিসর তাতে সপ্ত পাতাল অবস্থিত আর কটি হতে মস্তক পর্যন্ত পরিসরই সপ্ত স্বর্গ। যোগ শাস্ত্রেও ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সেগুলিকে জীবের দেহভাণ্ডে অবস্থিত দেখান হয়েছে।

সমষ্টিগত ভাবে যা ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে ব্যষ্টিজীব দেহেও তাই। কথায় বলে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে[২] বা বলা হয়েছে স্বর্গ মর্ত পাতালে যেখানে যা অবস্থিত আছে সেই সকল বস্তু মেরুকে বেষ্টন করে রয়েছে।[৩] যাক্, এখানে দেহের যেখানে মূলাধার বা গুহ্যদেশ সেইখানকে বলা হল ভূলোক। আর বিরাট দেহের ভূলোক হ'ল এই পৃথিবী। এই ভূলোক সপ্ত সমুদ্রের দ্বারা সপ্তখণ্ডে বিভক্ত। এইগুলিকে এক একটি দ্বীপ বলে। যেমন জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর প্রভৃতি সাতটি দ্বীপ।[৪] এই দ্বীপগুলি আবার সাতটি সমুদ্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত। এই সমস্ত সমুদ্রগুলির নাম হ'ল—লবণ, ইক্ষু,

১। সপ্ত স্বর্গং পরেশানি ক্রমেন শৃণু সাদরম্।
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকং মহসন্তথা॥
জনলোকস্তপশ্চৈব সত্যলোকং বরাননে।
সপ্তস্বর্গমিদং ভদ্রে পাতালং শৃণু যত্নতঃ॥ তোড়লতন্ত্র

২। ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞিতে দেহে যথা দেশে ব্যবস্থিত। শিবসংহিতা—৬

৩। ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহার প্রবর্ত্ততে॥—ঐ—৪

৪। জম্বু প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরোদ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ। বিষ্ণুপুরাণ

সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল।[১] এই সাতটিই সমুদ্র। দ্বীপ সাতটি আবার বর্ষ দ্বারা বিভক্ত। পৃথিবীর মধ্যখানে জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপটি নয়টি বর্ষে বিভক্ত। এইগুলিই হ'ল ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ বর্ষ, হরি বর্ষ, রম্যক্ বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ, কুরু বর্ষ, ভদ্রাশ্ব বর্ষ, কেতুমাল বর্ষ, ইলাবৃত বর্ষ। এইভাবে প্রতিটি দ্বীপ এক একটি সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। আর দ্বীপগুলি কয়েকটি করে বর্ষে বিভক্ত। যেমন প্লক্ষ দ্বীপ, শাল্মলী দ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ প্রভৃতি সাতটি করে বর্ষে বিভক্ত। এই সমস্ত দ্বীপের আয়তন হ'ল যথাক্রমে জম্বুদ্বীপ এক লক্ষ যোজন, প্লক্ষদ্বীপ দুই লক্ষ যোজন, শাল্মলীদ্বীপ চারি লক্ষ যোজন, কুশদ্বীপ আট লক্ষ যোজন, ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষোল লক্ষ যোজন, শাকদ্বীপ বত্রিশ লক্ষ যোজন এবং পুষ্করদ্বীপ চৌষট্টি লক্ষ যোজন বিস্তৃত।

এই সমস্ত দ্বীপগুলি এক একটি সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা, প্লক্ষদ্বীপ ইক্ষু সমুদ্র দ্বারা, শাল্মলীদ্বীপ সুরা সমুদ্র দ্বারা, কুশদ্বীপ ঘৃত সমুদ্র দ্বারা, ক্রৌঞ্চদ্বীপ দধি সমুদ্র দ্বারা, শাকদ্বীপ দুগ্ধ সমুদ্র দ্বারা এবং পুষ্করদ্বীপ জল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই জল সমুদ্রের পরিধি হ'ল এক শত আটাশ লক্ষ যোজন। জল সমুদ্রের পরপারে রয়েছে কাঞ্চনীভূমি। কাঞ্চনীভূমির গর্ভে যেন প্রপুরিত রয়েছে এক একটি করে সাতটি দ্বীপ। দ্বীপগুলির মধ্যে আবার সর্ব মাঝখানে রয়েছে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে লবণ সমুদ্র, এই লবণ সমুদ্রের পরপারে প্লক্ষদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ ইক্ষু সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, এমনিভাবে একটির পর আরেকটি দ্বীপ ও সমুদ্র অবস্থিত। শেষে হ'ল পুষ্কর যা জল সমুদ্র দ্বারা আবৃত। এই হ'ল সমুদ্রের পরপারে কাঞ্চনভূমি। কাঞ্চনভূমি লোকালোক পর্বত দ্বারা

১। এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্তসপ্তভিবাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধি দুগ্ধ জলৈ সমম্॥ ঐ

পরিবেষ্টিত।[১] লোকালোক পর্বতের চারপাশে অন্ধকার। এই সমস্তকে একত্রে বলা হয়—অণ্ডকটাহ। 'অণ্ডকটাহ' মানে এই ভূমণ্ডল—যার আয়তন পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। এই সমস্ত আয়তন নিয়ে হ'ল বিরাট পুরুষের ভূলোক। ভূলোকের ঊর্ধ্বে ভুবলোক। ভুবলোক হ'ল পৃথিবী আর সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী স্থান। পৃথিবীর এক লক্ষ যোজন উচ্চে হ'ল সূর্য। তাহলে পঞ্চাশৎ হাজার যোজনের মধ্যেই ভুবলোক।[২] এই ভুবলোকে সিদ্ধ পুরুষেরা বসবাস করেন। অবশ্য যাস্কাচার্য সমগ্র দেবতামণ্ডলীকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—ভূলোকের দেবতা, দ্যুলোকের দেবতা এবং অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। ভূলোকের অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর দেবতা মণ্ডলীকে বাদ দিলে দ্যুলোক আর অন্তরীক্ষলোকের যে সমস্ত দেবতাকে পাওয়া যায় তাদেরকে উচ্চলোকের দেবতাই বলা যেতে পারে। দ্যুলোকের দেবতা হলেন সূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যুঃ, পূষা, সবিতা, আদিত্য, অশ্বিনীযুগল, উষা, রাত্রি আর অন্তরীক্ষলোকের দেবতা হলেন ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ, অপাং-নপাৎ (বিদ্যুৎ) পর্জন্য। ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, দ্যুলোক মূলতঃ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। সূর্যমণ্ডল হতে লক্ষ যোজন দূরত্বে চন্দ্র। চন্দ্র হতে লক্ষ যোজন দূরত্বে নক্ষত্র, নক্ষত্র হতে দুই লক্ষ যোজন করে ব্যবধানে রয়েছে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে এক লক্ষ যোজন দূরে ধ্রুব নক্ষত্র।[৩] এই ধ্রুবলোক

১। স্বাদূদকস্য পরতো দৃশ্যতেঽলোকসংস্থিতি
দ্বিগুণা কাঞ্চনীভূমি সর্বজন্তু বিবর্জিতা।
লোকালোকস্তথাশৈলো যোজনাযুত বিস্তৃতঃ।
উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যাচলোহিসঃ॥ বিঃ পুরাণ

২। ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম্॥

৩। বিষ্ণু পুরাণ—৭ অঃ ৩—১০

পর্যন্ত পরিসরকে স্বর্লোক বলা হয়। অর্থাৎ ভূ, ভুব, স্বর্লোক ধ্রুবলোক পর্যন্ত। মানুষের যজ্ঞাদির ফলভোগ এই তিন লোকের মধ্যেই হয়ে থাকে। কল্পান্তে স্বর্লোক পর্যন্ত সমস্ত ধ্বংস হয় আবার পুনরায় সৃষ্টি হয়। ধ্রুবলোকের কোটি যোজন ব্যবধানে মহর্লোক, ভৃগু আদি মুনিরা সেই স্থানে বাস করেন। এই মহর্লোকের এক কোটি যোজন উর্ধ্বে জনলোক। সেখানে অবস্থান করেন ব্রহ্মার পুত্রেরা। জনলোকের আট কোটি যোজন উর্ধ্বে তপোলোক। সেখানে থাকেন বৈরাজ নামক দেবতাগণ। তপোলোকের দ্বাদশ কোটি যোজন উর্ধ্বে সত্যলোক। সত্যলোকই ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ। সত্যলোকের বাসিন্দাদের মৃত্যু নাই আর জন, তপ ও সত্যলোক কল্পে ধ্বংস হয় না সেইজন্য এই তিন লোককে বলে 'অকৃত' আর ভূ, ভুব, স্ব তিনলোক কল্পে কল্পে ধ্বংস ও সৃষ্টি হওয়ায় বলা হয় 'কৃতক'। ছয়লোকের মাঝে রয়েছে মহর্লোক। এই মহর্লোক কল্পান্তে জনশূন্য হয় কিন্তু ধ্বংস হয় না। সেজন্য ইহাকে বলা হয় 'কৃতাকৃতক'।[১]

কোন কোন পণ্ডিতেরা এই চতুর্দশ ভুবনকে জীবদেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য সংস্থাপনপূর্বক বর্ণনা করে থাকেন। আগম গ্রন্থে জীবের নাভি হতে ভূলোক ধরা হয়েছে। হৃদয় ভুবর্লোক, কণ্ঠে স্বর্লোক, চক্ষু মহর্লোক, ভ্রু জনলোক, ললাট তপলোক, ব্রহ্মরন্ধ্র সত্যলোক। দেহের এই সপ্তস্থানকে সপ্তস্বর্গ বলা হয়।[২]

চতুর্দশ ভুবনের সহাবস্থান নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভাগবতে নাভিস্থলে অন্তরীক্ষলোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষে মহর্লোক, গ্রীবায় জনলোক, স্তনে তপলোক, মস্তকে সত্যলোক।[৩]

১। বিষ্ণু পুরাণ—১১ অঃ ১১—২০

২। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী।

৩। ভাগবত ৫ অঃ ২ স্কন্ধ।

ভাগবতপুরাণে অধঃ সপ্তলোক

ভূ-স্থানের নিম্নে অযুত যোজন দূরক্রমে এক একটি লোক রয়েছে। এই লোকগুলির নাম অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। ঐ সমস্ত লোকগুলি নানা রকমের সাজ-সজ্জায় ভরপুর, তাছাড়াও ভোগ-বিলাসের বিবিধ সামগ্রী এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেখানে আছে যে স্বর্গ রাজ্যেও এত আধিক্য নাই বললেই হয়।নসেই পরিবেশে দৈত্য, দানব, নাগ প্রভৃতিরা পরম সুখে স্ত্রী-পুত্র-সংসার নিয়ে বসবাস করেন। তাদের ভোগ ইন্দ্রের স্বর্গ সুখের মাত্রারও অধিক। মায়ার সাহায্যে তাঁরা নানা প্রকারের আমোদ-প্রমোদ করে। সুন্দর সুন্দর নগর, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী সেখানে রয়েছে। সেই সমস্ত নাগবাড়ি অপূর্ব শোভায় শোভান্বিত। স্বর্গ শোভার হতেও আরো কিছু। এমন কি লতাগুল্মাদির এত সুন্দর কারুকার্য্য যে দেখলে মন আপনা হতেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। সেখানকার সরোবরে নানা বর্ণের নানা আকৃতির মৎস্য, জলের উপরিভাগে লাল নীল বিভিন্ন বর্ণের পদ্মপুষ্পের বন। সেই পদ্মপুষ্পের বনে পাখীরা মনের আনন্দে গান করছে যা কর্ণে প্রবেশ করলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। ভূ-লোকের তলদেশে এই সমস্ত লোক অবস্থিত হওয়ায় সূর্যের কিরণ না থাকলেও নাগগণের মস্তকে যে মণি থাকে তার দীপ্তিতেই সেখানকার অন্ধকার দূরীভূত হয়।

সেখানকার অধিবাসীরা সেখানকার গাছ-গাছড়ার ঔষধাদি পান করে বলে ব্যাধির চিহ্নমাত্র তাদের থাকে না। আর ব্যাধি না থাকলে শরীরের বার্ধক্যও দেখা দেয় না। এমনি অধিক বয়স হলেও না।

অতল পাতালে মায়ের ছেলে 'বল' নামে এক অসুর বাস করেন, সেই অসুর ছিয়ানব্বই রকমের মায়া সৃষ্টি করতে পারে। বলের মুখে হাই উঠলে স্বৈরিণী, কামিনী, পুংশ্চলী নামক স্ত্রীর সৃষ্টি হয়। যে স্ত্রী সবর্ণ পুরুষে রত তাকে স্বৈরিণী স্ত্রী বলে ; আর যে সবর্ণ অসবর্ণ হয়েই

রত সেই হ'ল কামিনী, যে কামিনী হয়েও চঞ্চল সেই পুংশ্চলী। সেখানকার পুরুষদের সেই স্ত্রীরা হাটক রস পান করায় এবং স্বেচ্ছামত পরিচালনা করে।

অতলের নীচে বিতল। সেখানে স্বয়ং শিব হাটকেশ্বর নামে পরিচিত। সেখানে তিনি ভূতপ্রেতাদি নিয়ে ভবানীর সঙ্গে বসবাস করেন। শিব-শিবানীর বীর্যে 'হাটকী' নদী এখান হতে সৃষ্টি হয়েছে। অগ্নি বাতাসের সাহায্যে সেই হাটক রস পান করে থাকে। পরে এই হাটক রস কঠিন করে ফুঁ দিয়ে বার করে ফেলে। তাই হল সোনা। সেই সোনা দিয়ে তারা নানা অলঙ্কার তৈরী করে পরিধান করে।

বিতলের পর সুতল। এই সুতলে বিরোচনের পুত্র 'বলি' বাস করেন। ইন্দ্রের প্রিয় কাজ করে দিলে ভগবান অদিতির গর্ভে বামন-রূপে জন্ম নিয়ে বলিকে সুতলে প্রেরণ করেন। সুতলে বলি এত ভোগ সামগ্রী, বিষয়-বৈভবের অধিকারী হয়েছেন যে স্বর্গের ইন্দ্রকেও হার মানিয়ে দেন। তিনি আজও সেই সুতলে ভগবানের উপাসনায় রত। এই সুতলে বাস ইহা ভগবানকে ভূমিদানের ফল নয়। ভগবানকে কিছু দান করলে তা মুক্তি মোক্ষের কারণ হয়। যে কোন ভাবে শ্রীভগবানের নাম করলে জীব সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়। এই মুক্ত হওয়ার জন্য কত মহাত্মা মহাজনরা আত্মদান করেছেন। ভোগ ঐশ্বর্য লাভ ভগবানের দয়ার ফল নয়। কারণ ভোগ ঐশ্বর্য লাভ করলে মন হতে স্বাভাবিক ভাবেই ভগবানের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, চলে যায়। কাজেই ঐশ্বর্য হ'ল ভগবান লাভের পথে বাধা। ভগবান কৃপা পরবশ হয়ে বলির কাছে ত্রিলোক অপহরণ করে নিয়েছিলেন এবং শরীর মাত্র অবশিষ্ট রেখে বরুণের পাশে বেঁধে পাহাড়ের গুহায় নিক্ষেপ করেছিলেন। রাজা বলি তখন বলেছিলেন হায়! ইন্দ্র ভগবানকে দিয়ে আমার কাছে রাজ্য চাইলেন। তাঁর দাস্য চাইলেন না। রাজ্য ঐশ্বর্য অতীব তুচ্ছ জিনিষ তার মূল্যই বা কতটুকু। আমার পিতামহের মৃত্যুর পর ভগবান

প্রহ্লাদকে রাজত্ব দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রহ্লাদ নিতে রাজী হন নাই। তাঁর দাস্যভক্তি চেয়েছিলেন।

বলিরাজা প্রকৃত ভক্ত। তাই রাজ্য ধনসম্পদকে তুচ্ছ দেখতেন। সেইজন্যই শ্রীভগবান বলি রাজার দ্বারে দ্বারপালের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রাবণ একবার বলিরাজের গৃহে অনুপ্রবেশ করতে গেলে ভগবান তাঁকে পায়ের আঙ্গুলে করে অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন।

তারপর তলাতল। 'ময়' নামক দানব রাজাকে শ্রীভগবান এই তলাতলে স্থান দিয়েছিলেন।

মহাতল। সেখানে বহু ফণাবিশিষ্ট ক্রুদ্ধ স্বভাবের সর্প বাস করে। সেই সমস্ত সর্পের মধ্যে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ প্রভৃতি প্রধান।

রসাতল। সেখানে দৈত্য-দানব অসুররা অবস্থান করে। জন্ম থেকেই এরা মহাতেজস্বী। এরা ইন্দ্রকে ভয় করে।

পাতাল। যেখানে বাসুকী, শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ প্রভৃতি নাগরাজরা বাস করে। এই সমস্ত নাগ রাজের কারো পাঁচ, সাত, দশ, হাজারটি মস্তক বিশিষ্ট। মস্তকে এদের মণি রয়েছে। যে মণির আলোয় পাতালের অন্ধকার দূরীভূত হয়।

দেবীপুরাণে নরক ও পাতালের স্বরূপ পরিচয়

দেবীপুরাণের মধ্যেও অনেকানেক নরকের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে যে সমস্ত পাতালপুরের বিবরণ পাওয়া যায় তা, ভোগ-বিলাসের প্রভৃতি সামগ্রীর প্রাচুর্যতাই পরিলক্ষিত হয়। পুরগুলির সাজসজ্জা অতীব মনোরম অতীব সুখকর। এমন ভোগবিলাসের আতিশয্য মেরু-পৃষ্ঠের কোন দ্বীপসমূহের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। কালরুদ্রপুরে যে প্রকার শত শত রূপময়ী স্ত্রী ও গৃহ আছে তা অন্য কোন স্থানে নাই বলা হয়েছে। কালাগ্নির পরিসর লক্ষযোজন বিস্তৃত, উদ্ভিদের পরিসর তাহার অর্ধেক, পাদ-পরিসর তাহার অর্ধেক। তার চারিদিকে মহা-ঘোর, মহাবল সিংহরূপী শক্ররূপী রুদ্রগণ রয়েছেন। এই সমস্ত রুদ্র-গণের নাম অনন্ত, পদ্মরুদ্র, ধাতা, কারণ, ঈশ্বর, দারুণ, অগ্নিরুদ্রা, যম-হন্তা, ক্ষয়ন্তক, লোহিত, ক্রুরতেজা, ঘনবৃদ্ধি, বলাহক, বিদ্যুৎ, চল, শীঘ্র, প্রসন্ন, শান্ত, সৌম্যদৃক প্রভৃতি। ইহারা দেবীকালিকার শক্তিসম্পন্ন। এই বিশ্বচরাচরে তাঁহারা সংহার করেন। কালাগ্নি ভুবনেশ্বর শতকোটি রুদ্রগণ কর্তৃক বেষ্টিত, তাঁহার পুরের পরিসর শতকোটি যোজন। আর সেখানকার যে ভোগ্যবস্তু আছে তা দেব-গন্ধর্বেরও সুদুর্লভ। সেই পুরের চতুর্দিকে অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা থাকেন। সেই পুরের মধ্যস্থানে কালরুদ্র বাস করেন। কালাগ্নি নরকের শেষ প্রান্তে কালপুর। এই কালপুরের পরিসর হল পাঁচ লক্ষ যোজন এবং ইহা বহু রত্নাদিতে হর্ম্যশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত গোলাকার। স্বর্ণময় ঐ প্রাচীরগুলি অযুত যোজন উচ্চতা বিশিষ্ট। প্রাচীরগুলিতে সদাই অগ্নি প্রজ্বলিত আছে এবং সেই সমস্ত অগ্নির বর্ণ কোথাও কিংশুক বর্ণ, কোথাও হরিতাল বর্ণ, কোথাও সিন্দুর বর্ণ। এই অগ্নির শিখা দুই কোটি নয় লক্ষ যোজন উত্থিত হচ্ছে। এই কালাগ্নিপুর হতে যে দীর্ঘ অগ্নিশিখা উচ্চে উত্থিত হচ্ছে সেই উচ্চেই অবস্থিত রয়েছে চার সহস্র নরক। চার সহস্র

নরকের মধ্যে প্রধান হল—অবীচি, কৃমি-ভক্ষ্য বৈতরণী, কূটশাল্মলি, উচ্ছ্বাস, যুগ্মপর্বত, রৌরব, নিরুচ্ছ্বাস, পূতিমাংস, তপ্তলাক্ষা, স্থিতাঞ্জন, ক্রকচ্ছেদ, পঙ্ক, কণ্টায়স, সুতাপিত, পূতিপূর্ণ, মেদস্তম্ভ, রুধির, বসা, তামিস্র, অপতুণ্ড, তীক্ষ্ণাসি, নপুংসক, লোহিত স্ত্রী, ভীম, অঙ্গার, কুম্ভীপাক, ক্ষুরমধ্য, সঞ্জীবন, সুতাপক, কালসূত্র, মহাপদ্ম, শীতক্ষুর, উষ্ণক্ষুর, অম্বরীষ, ঘোর, মহারৌরব, সংপুট, সূচমুখ, ইক্ষুযন্ত্র, তৈল, তপ্তত্রপু, অসিপত্র, অসিকাস্ত্র, শস্ত্র, পীন, করপত্র ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে আবার অবীচি, রৌরব, কুম্ভীপাক প্রধান। যারা দেব, ব্রাহ্মণ, গুরুর প্রতি হিংসা করে, স্ত্রীবধ করে তাঁরা ঐ সকল নরকে পতিত হয়। তাছাড়া আরো বিভিন্ন প্রকারের পাপকর্মের ফলভোগ করলে ঐ সমস্ত নরকে পাপীদের পতিত হতে হয়। শ্রীভগবান বলছেন—ঐ কালরুদ্র আশ্রমের ঊর্ধ্বদেশে অনন্ত শোভাময় হয়ে আমরা রয়েছি। আমাদের ঊর্ধ্বে রয়েছে সপ্তপাতাল ও নাগ, অসুর, যক্ষগণ। এদের মধ্যে কেহ কেহ নাগভক্ত, কেহ দেবীভক্ত আবার কেহ অভিন্নভাবে পূজাদি করেন। তাঁদের মুমুক্ষতার জন্য তাঁরা পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই সমস্ত ভক্তেরা বিভিন্নস্থানে বাস করেন দেহান্তে। স্থানগুলির নাম আভাস করতাল, শর্কর, গভস্তিক, মহাতল, সুতল, রসাতল, সপ্তলোক, অষ্টমলোক স্বুবর্ণ নির্মিত বলে আগম শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। দেবীভক্ত, রুদ্রভক্তরা দেহান্তে ঐ সমস্ত লোকে গিয়ে নাগকন্যাগণকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। ঐ সমস্ত স্থান স্বর্ণ, রত্নাদিতে ও বহুবিধ ভোগবস্তুতে পরিপূর্ণ। সহস্র সহস্র নাগকন্যা ঐ স্থানে বাস করেন। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের নাম হল নামুচি, শঙ্কুকর্ণ, মহানাদ, অনন্ত, কুলিক্য, এলাপাত্র। রাক্ষসদের মধ্যে শূলদন্ত, রক্তাক্ষ, বিকট প্রধান। ইহারা সকলেই দুঃখরহিত, দেবীর প্রতি অচলা ভক্তিপরায়ণ। ইহারা ঐ সমস্ত লোকে সহস্র স্ত্রীবেষ্টিত হয়ে সুখে কালাতিপাত করে থাকেন। ইহা ছাড়াও শতকোটি যোজন বিস্তৃত পাতাল রয়েছে যা বহুবিধ রত্ন-

সামগ্রীতে সুসজ্জিত। সেখানে কোটি কোটি রাক্ষস, অসুর, সর্প বাস করে। প্রহ্লাদ, অগ্নিজিহ্বা, অনুহ্রাস নামে তিনজন অসুর, বাসুকি, শঙ্খ-পাল, ধৃতরাষ্ট্র নামে তিনজন নাগ, বিদ্যুন্মালী, বিদ্যুৎজিহ্বা, হিরণ্যাক্ষ তিনজন রাক্ষস বাস করেন। এই স্থানের পরিবেশ অতিশয় মনোরম হওয়ায় দুঃখিত ব্যক্তিরও মনে আনন্দ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এরপর ত্রিতল নামে আরেক স্থান রয়েছে। সেখানে শিশুপাল, তারাক্ষ, অমর নামে তিনজন অসুর, কম্বল, ত্রম্বক, পদ্ম, নামে তিনজন নাগ বসবাস করে। চতুর্থ স্থানে দৈত্যগণ মহিষের ন্যায়, কালপৃষ্ঠ কর্কোট, শঙ্কুকর্ণ, তিনজন নাগ, মহাদেব, মহাকায় ও মহাভুজ তিনজন রাক্ষস থাকেন। পঞ্চম স্থানে অমর, তারাক্ষ, শুভ নামে তিনজন অসুর, সুপর্ণ, কুলিক এবং ধনঞ্জয় নামে তিন নাগ, অস্তি, ভদ্র, বিরূপাক্ষ নামে তিন রাক্ষস বাস করেন। ষষ্ঠ স্থানে কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ ও নিশুম্ভ নামে তিনজন অসুর রয়েছে। ষষ্ঠ স্থানের এক ইতিহাসে বলা হয়েছে যে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্র দেশে এক ব্রাহ্মণের তস্কর বল্লভ নামে এক পুত্র ছিল। তিনি সকলের দ্রব্য চুরি করে বেড়াত। একদা চৌর্য কার্যে মলয় পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে নগর দ্বারে এক দেবী মন্দির ছিল। সেই নগরের অধিবাসীরা ঐ মন্দিরে বহু ধনসম্পদ ও রত্নাদিদ্বারা দেবীর পূজা করত। তস্কর বল্লভ সেই ধন অপহরণের জন্য রাত্রিতে সেখানে গিয়ে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। প্রদীপের আলোয় সে বহু দ্রব্য অপ-হরণ করে। তস্কর বল্লভ যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে খড়্গাকরোদ্যত নামে কাঞ্চীরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। ঐ রাজা দেবীর প্রতি ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন কিন্তু সদাসর্বদা মদ্য মাংস আহার, দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করতেন। এমনিভাবে সেই রাজা কালাতিপাত করেন। যথা-সময়ে মৃত্যু হ'লে বৈরোচনপুরে পিঙ্গাক্ষ নামে দশকোটি রাক্ষসের অধিপতি হন এবং দুষ্ট স্বভাব হয়েও তিনি অজয়, অমর ও বহু পরমায়ু লাভ করে ব্রহ্মলোকে বাস করেন। তাঁর এই সৌভাগ্যের মূলে ছিল

দেবীকে প্রদীপ দান। যদিও সে প্রদীপ দেবীর জন্য ভক্তিপূর্বক প্রদান করেন নাই তবু ঐ দীপদানের মাহাত্ম্য অসীম বলে এখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এরপর পাতালের নাগগণের বিষয় রয়েছে। ভগবান শুক্রকে বলছেন—"সেখানে পৌণ্ডরীক, শ্বেত, ভদ্র, এই তিনজন নাগ, পিঙ্গাক্ষ, মেঘনাদ এবং অঘোর এই নামে তিনজন রাক্ষস এবং রসাতলে জরাসন্ধ, বলি প্রভৃতি কোটি কোটি অসুরগণ বাস করে। তোমার সুবিধার জন্য বলিকে এখানে বেঁধে রেখেছি। আর সেজন্যই তুমি স্বর্গরাজ্যের অধিশ্বর হয়েছ—আমিও স্বস্থানে অবস্থান করছি। ত্রিষষ্টি ভুবনের মধ্যে সপ্ত-পাতাল শ্রেষ্ঠ। এই পাতালগুলি বৃত্তাকার আর শতকোটি যোজন বিস্তৃত। ঐ সমস্ত ভুবনে দৈত্য, রাক্ষস ও নাগের তিনটি করে বিভাগ রয়েছে। উহারা কল্পে কল্পে ধ্বংস হয় আবার সেই সেই নামে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর।

সপ্তপাতাল ছাড়া অষ্টম একটি উপপাতাল রয়েছে যা সুবর্ণময়। এখানকার পরিবেশ অতি মনোরম, ভোগবিলাসের সামগ্রীরও প্রাচুর্য থাকায় স্বভাবতই ঐখানকার প্রাণীদের মন ঐ পরিবেশে আকৃষ্ট হয়।

প্রেত, মহাপ্রেত ও পিশাচ

কি কর্মফলের জন্য প্রেতলোক বা প্রেতদেহ প্রাপ্তি ঘটে গরুড় প্রশ্ন করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব ঘটনা বললেন। ঘটনাটি ত্রেতা-যুগের। 'বভ্রুবাহন' নামক এক ধর্মনিষ্ঠ বলবান রাজা ছিলেন। তিনি অনেক সৎগুণের অধিকারী ছিলেন। প্রতিটি প্রজাকে তিনি পুত্রের ন্যায় ভালবেসে রাজ্য পরিচালনা করতেন। একদিন রাজা বনে মৃগয়া করতে গেলেন। গভীর অরণ্য—বহুবিধ হিংস্র জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ। মৃগ অনুসন্ধান করতে করতে ভ্রমণ করছেন এমন সময় একটি মৃগ দর্শন করে বাণ নিক্ষেপ করতঃ হরিণের পিছনে পিছনে ছুটলেন। ছুটতে ছুটতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যেন মূর্চ্ছিতপ্রায়। পরে জলাশয় অনুসন্ধান করে শীতল জল পান করে অশ্বারোহণপূর্বক অন্যত্র গিয়ে বটবৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রামে কালক্ষেপ করছেন, এমন সময় এক ক্ষুধার্ত প্রেতমূর্তি দেখতে পেলেন। সেই প্রেত মুক্তকেশ রুক্ষ ভাব, মাংসবিহীন দেহ। হস্তপদ অস্থিমাত্র সার। সেই প্রেতের সঙ্গে চতুর্দিকে আরো অনেক প্রেত বিদ্যমান দেখতে পেলেন। রাজা তাঁর সম্মুখে ঐ সমস্ত প্রেতগুলিকে দেখে বিস্মিত হলেন। প্রেত রাজাকে বললেন—'আজ আমি আপনাকে দর্শন করে পরমগতি লাভ করলাম। আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হ'লাম।' রাজা তখন সেই প্রেতের কথা শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদেরকে কৃষ্ণবর্ণ প্রেতের ন্যায় দেখছি; কিজন্য তোমরা এই প্রেত-দেহরূপে রয়েছো তা আমাকে ব'ল।' তখন এক প্রেত উত্তর দিল—'মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন জনবহুল স্থানে বহু রত্নসম্পন্ন ও বহুবিধ বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বৈদেশ নামক নগরে আমি বাস করতাম। আমি দেবতা পূজা করতাম। জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম সুদেব। আমি দেবপূজা-অর্চনা, ব্রাহ্মণের আরাধনা, দীন অনাথদের সাহায্য প্রভৃতি যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করতাম, কিন্তু সেই সমস্ত বৃথা হয়ে গিয়েছে। বৃথা হয়েছে এই কারণে

যে আমার এমন কোন সন্তান, সুহৃদ, মিত্র নাই যে সে আমার ঊর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া করবে। ঊর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া না করলেই প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। একাদশকৃত, ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কিছুই আমার হয় নাই। ষোড়শ শ্রাদ্ধ যার হয় না সে ত' শত শত শ্রাদ্ধ করলেও প্রেতীভূত হবেই। আপনাকে সমস্তই জানালাম। রাজাই হচ্ছেন সর্ববর্ণের বন্ধু। কাজেই আপনি আমাকে প্রেতদেহ হতে মুক্ত করুন—এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমাকে উদ্ধার করুন আর আপনার ঊর্ধ্বদেহিক কার্যের কথা চিন্তা করে এখন হতেই তৎপর হউন। রাজা তখন সেই প্রেতমূর্তিকে জানালেন, ঊর্ধ্বদেহিক কার্য সম্পন্ন করলেও কেন প্রেতত্ব প্রাপ্তি ঘটে, আর মানুষ কেনই বা প্রেত হয়ে থাকে?' প্রেতমূর্তি বললেন—'যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেবতার দ্রব্য, স্ত্রী ধন ও বালক ধন হরণ করে সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত হবেই। আর যারা তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্যা নারীতে গমন করে তারা মহাপ্রেত যোনি প্রাপ্ত হয়। যারা অনুজা হরণ করে তারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যারা প্রবাল, হীরক, বস্ত্র চুরি করে, হিরণ্যাপহর্তা, কৃতঘ্ন, নাস্তিক, ক্রূরকর্মা, সাহসিক শঠ, মহাদানসম্পন্ন হয়ে পঞ্চযজ্ঞবিহীন তারাই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়।'[১] এইবার

১। প্রেত উবাচ—

ব্রহ্মস্বং দেবদ্রব্যঞ্চ স্ত্রীণাং বালধনং তথা।
যে হরন্তি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রেতযোনিং ব্রজন্তি তে।
তাপসীঞ্চ সগোত্রঞ্চ অগম্যাং যে ভজন্তি হি।
ভবন্তি তে মহাপ্রেতা অনুজা নিহরন্তি যে॥
প্রবালবজ্রহর্ত্তারো যে চ বস্ত্রাপহারকাঃ।
তথা হিরণ্যহর্ত্তারঃ সংযুগেঽসম্মুখাগতাঃ॥
কৃতঘ্না নাস্তিকা রৌদ্রাস্তথা সাহসিকা নরাঃ
পঞ্চযজ্ঞবিনির্ম্মুক্তা মহাদানবতাশ্চ যে।
এবমাদ্যা মহারাজ জায়ন্তে প্রেতযোনয়ঃ॥

রাজা প্রেতকে বললেন—"এখন বলুন কি উপায়ে এই প্রেতত্ব হতে মুক্তি পাওয়া যায়। আর উর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াই বা কি প্রকারে করা যায় তাও সবিস্তারে বলুন।" প্রেত বলতে লাগলেন—"শাস্ত্র-শ্রবণ, বিষ্ণু পূজা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি প্রেতত্বনাশের কারণ। বিশেষ করে প্রেতত্বনাশের উপায় স্বরূপ বিষ্ণু পূজার বিধিও জানাচ্ছি। দুটি সুবর্ণ এনে একটি নারায়ণের প্রতিমূর্তি গঠন করতে হবে। সেই প্রতিমূর্তিকে সমস্ত রকমের আভরণে ভূষিত, পীতবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত, চন্দনাগুরু লেপন, বিবিধ জলদ্বারা অভিষেক, যত্নপূর্বক অধিবাস প্রভৃতি করবে। পূর্বদিকে শ্রীধর, দক্ষিণে মধুসূদন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে গন্ধ পুষ্পদ্বারা যথারীতি পূজা করবে। তারপর সেই দেবমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করে অগ্নিতে দেবতাদের তর্পণ পূর্বক অর্থাৎ ঘৃত, দধি, ক্ষীরদ্বারা বিশ্বদেবগণের তর্পণ করে, স্নান করে শুদ্ধাত্মা সমাহিত চিত্তে ও জপতৎপর হয়ে নারায়ণের অগ্রে বিধিমত উর্ধ্বদৈহিক কর্ম সুসম্পন্ন করবে। বিনীত ও ক্রোধাদি শূন্য হয়ে কার্য করতে হবে। সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধ করে বৃষোৎসর্গ করতে হবে। ত্রয়োদশ বিপ্রকে ছত্র, উপানহ, অঙ্গুরীয়, রত্নভোজন, আসন, ভোজনদ্রব্য প্রদান করতে হবে। প্রেতের হিতের জন্য অন্ন, জলপূর্ণ কুম্ভ, শয্যাঘট প্রভৃতি দান করতে হবে। আপনার নামের সঙ্গে নারায়ণ নাম যুক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে। এই প্রকারে কার্য করতে পারলেই মুক্তি।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রেতঘট কোন্ বিধানে করতে হয়?" প্রেত বললেন—"যে দান শ্রেষ্ঠ তাই প্রেতঘট তাই সর্ব অশুভ নাশ করে। স্বর্ণময় একটি ঘট প্রস্তুত করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, লোকপালের প্রতিমূর্তিসহ ঘটের মধ্যে দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করে ভক্তি সহকারে বিষ্ণুকে দান করতে হবে। এই ঘট-পূজাদি করে দুগ্ধ-ঘৃত-পূর্ণ ঘট দান করবে। এই দানই শ্রেষ্ঠ এবং মহাপাতক নাশক।"

এইভাবে রাজা শ্রবণ করে স্বদেশে ফিরে প্রেতবাক্যানুসারে ক্রিয়া সুসম্পন্নকরতঃ প্রেতের মুক্তি দিলেন।

গরুড়পুরাণে যমলোকের বিবরণ

ছয়শত সহস্র যোজন যমলোকের আয়তন বা পরিমাপ। যমলোকের পথ অতি ভীষণ প্রতপ্ত এবং দেখতে তাম্রবর্ণ, সর্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে এই পথে। সেইজন্য ইহা অতি ভীষণ মহাপথ। পাপীরাই এই পথে গমনাগমন করে। তাছাড়াও এই পথ তীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ কোথাও ছায়াহীন, আহারবিহীন, জলবিহীন। পাপীরা ঐ পথে গমনের সময় যদি বিশ্রামের জন্য ছায়া, আহারাদির প্রার্থী হয় তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই ঐ পথে। কোন আরামের ব্যবস্থা ত' নাই-ই বরং দুঃখ ব্যথা-বেদনা পাওয়ার জন্য কোথাও অতি শীত, কোথাও অতি ভীষণ অগ্নিতাপ বিদ্যমান রয়েছে যাতে পাপীরা অতি মাত্রায় কষ্ট পায়। সেজন্য ঐ পথে গমনের সময় জীবাত্মারা দুঃখকষ্টে হাহাকার করে, চিৎকার করে। কিন্তু যারা সংসারে আসক্তিশূন্য তারা ঐ মহাপথে সুখেই গমন করে। পুণ্যাত্মারা যে দান জীবনে করেছে তা' তারা সেখানে যাওয়ামাত্র প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পাপীরা কিছু ত' প্রাপ্ত হয়ই না বরং বায়ুভক্ষণ করে ইতস্তত ভ্রমণ করে বেড়ায়। যমলোকের গতিপ্রকৃতি ভিন্ন। যেমন দক্ষিণ ও নৈঋর্ত দিকে যে যমপুর আছে তা' বজ্রময়, সুরাসুরে অভেদ্য। ঐ যমপুর চারিদ্বার বিশিষ্ট সাতটি প্রাকার ও সাত তোরণ বিশিষ্ট। এই পুরেই যমরাজ অবস্থান করেন। ইহার আয়তন সহস্র যোজন। বিবিধ রত্নরাজিতে সমুজ্জ্বল, সূর্য কিরণে আলোকিত। আর যমরাজের গৃহের উচ্চতা হ'ল বিংশতি যোজন, অতি বিস্তৃত এবং কাঞ্চনপ্রভ। তাছাড়া সহস্র স্তম্ভযুক্ত এই গৃহ, বহু মণিমণ্ডিত পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত আর গবাক্ষগুলি মুক্তাজালে সজ্জিত। শত শত ঘণ্টাবাদ্য, শত শত তোরণে বাজিত হয়। বহু বিবিধ সাজ-সজ্জায় পরিপূর্ণ প্রতিটি গৃহ। যমরাজ সর্বদা ধর্মকার্যে ব্যস্ত এবং শুভ আসনে উপবিষ্ট। এই যে ধর্মরাজ উপবিষ্ট তা' পাপাত্মাদের কাছে ভয়প্রদ আর পুণ্যাত্মাদের কাছে

সুখপ্রদ। সুগন্ধ বায়ু, নানাবিধ উৎসব, শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রভৃতি এখানে হইতেছে। চিত্রগুপ্তের একটি গৃহ আছে। চিত্রগুপ্তের গৃহটি পঞ্চবিংশতি যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উচ্চ ও লোহার প্রাকার বেষ্টিত। শত শত পথ রয়েছে, বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করা যায়। প্রতিটি পথে পতাকা, প্রদীপ, বাদ্য, মণিমুক্তা শোভা পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের সাজসজ্জায় ভূষিত আশ্চর্য আসন। ঐ আসনে উপবেশনপূর্বক চিত্রগুপ্ত জীবের আয়ুষ্কালের পরিমাপ করেন। তিনি নিজে কোনই সুকৃত দুষ্কৃত কার্যে লিপ্ত হন না। বরং জীবের আজন্ম অর্জিত সৎ অসৎ ও অষ্টাদশ দোষসকল নির্ণয়পূর্বক লিখিত রাখেন। চিত্রগুপ্তের গৃহের পূর্বদিকে জ্বরের মহাগৃহ। দক্ষিণ দিকে শূল, লুতা ও বিস্ফোটকাদি গৃহ ; পশ্চিমদিকে কালপাশ, অজীর্ণ, অরুচি গৃহ, উত্তর দিকে বিসূচিকা, ঈশান দিকে শিরো রোগ, অগ্নি কোণে মূর্চ্ছা, নৈঋ´ত কোণে অতিসার, বায়ু কোণে দাহ প্রভৃতি রোগসকল পূর্ণগৃহ রয়েছে। ঐ রোগসকল চিত্রগুপ্তের গৃহের দশদিক ব্যাপী বিদ্যমান। চিত্রগুপ্ত জীবের কর্মফল লিখে রাখেন এবং পাপীদের বহুবিধ শাস্তি দেন। মুদ্গর দ্বারা প্রহার, পাশ দ্বারা বদ্ধ, ক্রকচ দ্বায়া ছেদন, নানা যন্ত্র দ্বারা পাপীদের পীড়ন করেন যমদূতেরা। কোন কোন পাপীর দেহ অগ্নিতাপে তাপিত হয়ে পিণ্ডবৎ হয়ে দাঁড়ায়। আর কুঠার দ্বারা যমদূতেরা পাপীদের দেহ ছেদন করলে ভূমিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পতিত হয়। উত্তপ্ত তৈলে পাপীদের দেহ ভর্জিত করা হয়, তখন তারা কষ্টে রোদন করতে থাকে। 'দেহি দেহি' রবে ঋণ প্রার্থনা করে এমনকি তারা নিজের দেহের মাংস নিজেই ভক্ষণ করে। এমনি বহুভাবে যমলোকে পাপীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

গরুড়পুরাণে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের নিয়ম ও ফল

কি কি কাজ করলে ধর্মলাভ হয় তার কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বলছেন—'মৃত্যুর পর জীবের পাপপুণ্যই আগে আগে গমন করে থাকে। পুণ্য বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ আর কলিতে দান।'[১] স্মৃতিকারগণ বলেন—ইষ্টপূর্তাদি যাগ করলে পাপ নাশ হয়। তাছাড়াও যারা বৃক্ষরোপণ, জলাশয় খনন, দ্বিজজনে অগ্নি প্রদান প্রভৃতি করেন তাঁরা সুখে যমালয়ে গমন করেন। আর দ্রব্য দানের ফল অসীম। বসুন্ধরা দান করলে স্বর্ণ, রত্ন, মণি, বস্ত্র প্রভৃতি দানের ফল পাওয়া যায়। যে যা দান করেন মৃত্যুর পর যমলোকে সেই সেই দ্রব্য অগ্রে স্থাপন করা থাকে তার জন্য। পুত্র পিতার জন্য ভোজ্যাদি প্রদান করলে যমালয়ে তার পিতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেজন্য যমালয়ের পরিত্রাতা একমাত্র পুত্রই। নরক হতে পিতাকে উত্তোলন করেন বলেই 'পুত্র' নাম হয়ে থাকে। সেজন্য পিতার মৃত্যুর পর পুত্রকে শ্রাদ্ধ করতে হয়। পিতা মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ ধারণ করে পুত্রের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন। প্রেতদেহ যমালোকে গিয়ে কষ্টভোগ করতে থাকলে পুত্র পিতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করলে পিতা তার দ্বারা প্রীতি লাভ করেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনদিন অপক্ক মাটীর পাত্রে দুগ্ধ দান করার নিয়ম; তিনটি কাঠ দ্বারা তা' বন্ধনপূর্বক চতুষ্পথে স্থাপন করে দুগ্ধ দান করতে হয়। প্রেতদেহ আকাশের বায়ু অবলম্বন করে এসে

১। কৃতে তপঃ প্রশংসন্তি ত্রেতায়াং জ্ঞানসাধনম্।
দ্বাপরে যজ্ঞ-দানে চ দানমেকং কলৌ যুগে॥
গৃহস্থানাং স্মৃতো ধর্ম্ম উত্তমানাং বিচক্ষণৈঃ
ইষ্টাপূর্ত্তো শ্বশক্ত্যা হি কুর্ব্বতাং নাস্তি পাতকম্॥

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের প্রদত্ত সেই দুগ্ধ পান করেন।[১] মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে জ্ঞাতিবর্গ মিলে অস্থি সঞ্চয় করতে হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দিনে জলাঞ্জলি প্রদান করতে হয়। পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নের সময় কদাচ জলাঞ্জলি করতে নাই। পুত্রগণ, জ্ঞাতিবর্গ সকলেই জলাঞ্জলি প্রদান করতে পারেন। বিপ্রের শূদ্রের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দেওয়ার নিয়ম নাই। যদি কোন বিপ্র শূদ্রের চিতায় কাষ্ঠ আনয়ন করেন তবে সেই বিপ্র ত্রিরাত্র অশুচি হয়ে থাকেন। ত্রিরাত্র পরে সমুদ্রগামী নদীতে গিয়ে শতবার প্রাণায়াম করে ঘৃতপ্রাশন করে শুদ্ধ হতে হয়। শূদ্র সর্ববর্ণের, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং নিজেদের এই তিন বর্ণের, আর ক্ষত্রিয়—তার এবং ব্রাহ্মণের এই দুই বর্ণের, ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণের শবানুগমনপূর্বক জলাঞ্জলি প্রদান করার নিয়ম। পুত্রকে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর উত্তরীয়তে গ্রন্থি দিতে হবে এক বস্ত্রে কুশ, তিলযুক্ত করে জলাঞ্জলি দিতে হবে। যারা প্রেতের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করেন তাঁদেরকে নয় দিন দন্ত ধাবন ত্যাগ করতে হয়। দাহ সম্পাদন কার্যে গমনকালে স্ত্রীলোকরা আগে আগে এবং পুরুষ মানুষরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করবে। তারপর পাষাণের উপর বসে আচমন করবে। পূর্ণপাত্রে যব, সর্ষপ, দুর্বা দশন এবং নিম্ব-পত্র প্রাশন, ঘৃতস্পর্শ করে স্নান করতে হয়। পূর্ব প্রস্তুত অন্নাদি ভোজন করা নিষিদ্ধ। সগোত্র ব্যক্তিদেরই এই নিয়ম পালন করতে হয়। মরণের পর মাটীর পাত্রে ভোজন করতে হয়; মৃত ব্যক্তির গুণগান এবং যশগাথা গান করার নিয়ম। মৃত্যুর পর অন্য দেহ ধারণ না করেই জীব পাপপুণ্য ভোগ করে। তখন বায়ুরূপে ভ্রমণ করতে থাকে এবং বায়ু কুটিতে আগমন করে। নব শ্রাদ্ধ এবং ষোড়শ শ্রাদ্ধ

১। প্রথমেঽগ্নি দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ তথা খগ
আকাশস্থং পিবেদ্দুগ্ধং প্রেতো বায়ুপূর্দ্দয়ঃ ॥

সম্পন্ন হ'লে সেই বায়ু কুটীতে প্রবেশ করতে পারে। তিলদর্ভ আস্তরণ করাতে কুটি ধাতুময়ী হয়। মুখে পঞ্চরত্ন প্রদানে জীব প্ররোহ হয়। মৃত্যুর পর জীব পশুত্ব বা স্থাবরাদি প্রাপ্ত হলেও শ্রাদ্ধ দ্রব্য তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই জন্য যতকাল দেহ উৎপন্ন না হয় ততদিন শ্রাদ্ধদ্বারা তাকে প্রীত করার নিয়ম। যার তর্পণ হয় না সে ক্ষুধিত বা ভ্রান্ত হয়ে থাকে। পিণ্ডদান দ্বারা যে অন্নদান করা হয় সেই অন্ন আকাশে ভ্রমণ করে। প্রেত তিনদিন জলে, তিনদিন অগ্নিতে, তিনদিন আকাশে এবং একদিন বায়ুতে বাস করে। দাহের পর সেজন্য জলদ্বারা তর্পণ, স্নেহ স্নান, পুরক পিণ্ডদান, কুশের দ্বারা গৃহে পিণ্ডদান এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশে শ্রাদ্ধ করতে হয়। গৃহদ্বার, শ্মশান, তীর্থ, দেবালয় স্থানে প্রথমে পিণ্ডদান কার্য করা যায়। শুদ্ধির জন্য সকল বর্ণেরই স্নান করা কর্তব্য। শ্রাদ্ধ করার পরও স্নান করা বিধি। ব্রাহ্মণকে যথাসাধ্য শয্যা ও দান দেওয়ার নিয়ম। স্বগোত্রে শ্রাদ্ধের অধিকারী না থাকলে অপর ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করতে পারেন। প্রথম দিনের যিনি পিণ্ড দিবেন তাঁর দ্বারাই সমস্ত শ্রাদ্ধ করাতে হয়। দশদিন ব্যাপী নামগোত্র উল্লেখ করে অমন্ত্র শ্রাদ্ধ করতে হবে। প্রথম পিণ্ডদান যিনি করবেন তিনিই দশদিন পর্যন্ত পিণ্ডদান করেন। এই দশদিন পিণ্ডদান করলে তবেই আতিবাহিক দেহ গঠিত হয়। মাসিক শ্রাদ্ধ করলে দেহের পুষ্টিসাধন হয়। অশৌচ যতকাল ততকাল পিণ্ড দেওয়ার রীতি। চতুর্বর্ণের পিণ্ড দেওয়ার প্রথা রয়েছে। প্রথমদিনে তিনটি, দ্বিতীয়দিনে চারটি, তৃতীয়দিনে তিনটি পিণ্ডদান করতে হয়। পিণ্ডদান সময় দুগ্ধ ও জল ভিন্ন করে দিতে হয়। চতুর্থ দিনে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করতে হয়। দশটি যে পিণ্ড দেওয়া হয় তার প্রথম পিণ্ডে মস্তক ; দ্বিতীয় পিণ্ডে চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ; তৃতীয় পিণ্ডে গণ্ড, মুখ, গ্রীবা ; চতুর্থ পিণ্ডে হৃদয়, কুক্ষি, উদর ; পঞ্চম পিণ্ডে কটি, পৃষ্ঠ, গুহ্য ;

ষষ্ঠ পিণ্ডে উরুদ্বয় ; সপ্তম পিণ্ডে গুল্‌ফ ; অষ্টম পিণ্ডে জঙ্ঘাদ্বয় ; নবম পিণ্ডে পাদদ্বয় এবং দশম পিণ্ডে ক্ষুধাবোধ হয়। একাদশে প্রেতের উদ্দেশ্যে সমন্ত্রক পিণ্ডদান করতে হয়। সিদ্ধান্ন, শর্করা পিষ্টক, দুগ্ধ দান করতে হয়। ব্রাহ্মণের পদ ধৌত করে অর্ঘ্য প্রদান ও পূজা করা নিয়ম। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ শ্রাদ্ধ, একাদশ মাসে একাদশাহ শ্রাদ্ধ, প্রথম যাম্মাসিক, দ্বিতীয় ষাম্মাসিক সপিণ্ডীকরণ এই সমুদয় ষোড়শ শ্রাদ্ধ হয়। মৃত্যু দিবসের তিথি ধরে পরবর্তী সেই তিথি পর্যন্ত এক মাস হয় এবং প্রতি মাসেই শ্রাদ্ধ করার নিয়ম। মৃত্যুস্থানে ব্রাহ্মণের সামনে যে শ্রাদ্ধ তাই প্রথম শ্রাদ্ধ। যে তিথিতে মৃত্যু হয় তার সেই তিথি মাসিকে প্রশস্ত। রিক্ত ও ত্রিপক্ষের তিথি বর্জনীয়! পূর্ণিমাতে মৃত্যু হলে তার পক্ষে চতুর্থী, চতুর্থীতে মৃত্যু হলে নবমী, নবমীতে মৃত্যু হলে চতুর্দশী রিক্তা হয়। সেই রিক্তাতে শ্রাদ্ধ করা নিষেধ। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় পারদর্শীরা এই ব্যবস্থা করেন। একদশাহ শ্রাদ্ধে অন্নপাক করে প্রেতকে দিয়ে স্নান করতে হয়। শয্যা দানে দেবতারা প্রশংসা করেন। সেজন্য মৃত্যুর আগেই শয্যা দান করার নিয়ম।

জীব ক্ষণস্থায়ী। আর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা হ্রাস পায়। সেজন্য নিজেই নিজের উদ্ধারের জন্য জীবিত অবস্থাতেই শয্যা দান করতে হয়। সেই শয্যা উত্তম কাষ্ঠের এবং উত্তম শয্যা সংগ্রহ করে লক্ষ্মীমূর্তির সহিত শ্রীহরির মূর্তি স্থাপন পূর্বক ঘৃত কলস পরিকল্পনা করবে। ইহার নাম নিদ্রা-কলস। ইহা প্রেতের প্রীতিকর। তাছাড়া বহু প্রকারের নিত্য ব্যবহার্য উপকরণ নিত্য ব্যবহার্য উত্তম খাদ্যসকল ব্রাহ্মণকে দান করলে প্রেত আত্মার কল্যাণ হয়ে থাকে। একাদশাহের শ্রাদ্ধের ফল অসীম। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির যা-কিছু বস্তু অর্থাৎ তাঁর বস্ত্র, পাত্র ইত্যাদি দান করার নিয়ম। মৃতের শয্যার উপর বিষ্ণু স্থাপন করে পূজা করলে মৃত ব্যক্তি ইন্দ্রলোক এবং সূর্যলোকে বাস করেন। শয্যা দান করলে আর-যমদূতেরা যন্ত্রণা দিতে সক্ষম হয় না।

শয্যাদানের আরো ফল হল যমপুরের শীততাপ হতে সেই ব্যক্তি মুক্ত থাকে। ষোড়শ শ্রাদ্ধ শয্যা দান ও বাৎসরিক ক্রিয়ায় পাপী ব্যক্তিরাও স্বর্গে গমন করে এবং প্রলয়ান্ত পর্যন্ত সুখে থাকে। নারীর ক্ষেত্রেও এই প্রকার।

বৈতরণী নদী

তাহলে পাপ কর্মানুষ্ঠানে নিকৃষ্ট যোনিভোগ অবশ্যম্ভাবী। ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য ঊর্ধগতি এবং পাপীদের জন্য অধোগতি শাস্ত্রে নির্ণিত হয়েছে। সকল বর্ণের জন্যই এই ব্যবস্থা জানতে হবে।

পাপকর্মের ফলভোগস্বরূপ যমদ্বারে বৈতরণী নামক এক ভয়ঙ্কর মহানদী বিদ্যমান আছে। এই নদী শতযোজন বিস্তীর্ণা। নদীর জল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। জীবগণের শ্লেষ্ম, মাংস, পূয, রক্তই এই নদীর জল। ক্রিমি-কীটাদিতে এই নদীর জল পূর্ণ এবং হিংস্র জলজন্তু ঐ নদীতে থাকায় পাপীদের দেহের মাংস আহারে তারা তৎপর। সেজন্য পাপীরা ঐ নদী দর্শনমাত্র ভয়ে আতঙ্কিত হয়। ভয়ে তখন 'হে ভ্রাতা', 'হে মাতা', 'হা পুত্র' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে রোদন করতে থাকে। এই নদীতে পতিত হয়ে জীব অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। যারা দান-ধ্যান করেছে জীবনে তারাই মাত্র ঐ নদী উত্তীর্ণ হয় আর যারা জীবনে দান কর্ম করেন নি তারা ঐ নদীর জলে পতিত হয়ে হাবুডুবু খেতে থাকেন, কষ্টভোগ করেন। যাঁরা মাতা, পিতা, আচার্যদের অবমাননা করেন, পতিপরায়ণা ধর্মশীলা স্ত্রীকে যে স্বামী ত্যাগ করে, মিত্র, তপস্বী, স্ত্রী, বালক ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সেই ব্যক্তি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণকে যে অত্যাচার করে, ব্রাহ্মণের প্রতিশ্রুত দ্রব্য যিনি প্রদান করেন না, যজ্ঞবিঘ্নকারী, বহুপত্নীগামী, রাজপত্নীগামী, পিশুনাচার, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কূট সাক্ষ্যদাতা, মদ্যপায়ী এই সমস্ত পাপিষ্ঠরা ঐ বৈতরণী মহানদীতে পতিত হয়ে অশেষ ক্লেশভোগ করে। তা ছাড়াও যে ব্যক্তি ক্ষেত্র ও সেতুভেদ করে, পরদ্বারের অবমর্ষণ করে, যে ব্রাহ্মণ রস বিক্রয় করে মাংস ভোজন করে, বৃষলী গমন করে, কন্যা বিক্রয় করে, অপরকে ব্যথা দান করে, যে শূদ্র কপিলার দুগ্ধ দান করে, এই জাতীয় পাপাত্মারা ঐ নদীতে

বাস করে। কৃপণ, নাস্তিক, সঙ্কীর্ণমনা, দ্বেষপরায়ণ ক্রোধী, নিজ মত রক্ষণে তৎপর ব্যক্তিরা বৈতরণীতে অবস্থান করেন। অহঙ্কারী আত্মপ্রশংসা প্রকাশ করে, অপরের উপকার যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরা চিরকাল ঐ নদীতে বাস করে থাকে। ঐ নদী উত্তীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা থাকলে অবশ্য জীবনে দান কর্ম করতে হয়। দক্ষিণায়ণে উত্তরায়ণে, ব্যতীপাতযোগে, দিনক্ষয়ে, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সময়, সংক্রান্তির দিবস, অমাবস্যা তিথিতে পুণ্য সময় মাত্রেই দান করা কর্তব্য। দান করার মনে ইচ্ছা হলেই দান করা কর্তব্য বা সেই সময়ই দানের সময়। কারণ জীবন মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু অনিশ্চিত, সেই হিসাবে কার কখন যে ইহলীলার সমাপ্তি ঘটবে তার নিশ্চয়তা নাই। তাই ধর্ম কাজে কোন সময়ের অপেক্ষা করতে নাই। কৃষ্ণবর্ণ, হেমময়শৃঙ্গ বিশিষ্ট, রূপার খুর বিশিষ্ট, কাঁসার পাত্র সমন্বিত, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রযুগলাচ্ছাদিত, সপ্তধান্য সমন্বিত বৈতরণী ধেনু দান করতে হয়। এই ধেনুই বৈতরণী নদী পাড়ি দেওয়ার একমাত্র উপায়-প্রত্যয়।

গরুড়পুরাণের প্রায়শ্চিত্ত বিধি

পাপকর্ম যেমন নরকভোগের কারণ প্রায়শ্চিত্ত আবার তেমনি পাপ মোচনের হেতু। পাপকর্ম করে তার ফল যখন ভোগ হয় তখন অনেকে প্রায়শ্চিত্ত বিধি অনুসরণ করে পাপের স্খালন করে থাকেন। তাতে রোগ থেকে এবং রোগ যন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ হয়।

গরুড়পুরাণের বিবরণটি প্রদান করা হ'ল। মাছি, জলবিন্দু, স্ত্রী, জল, অগ্নি, বিড়াল ও নকুল এই প্রাণীগুলি সকল সময়ই শুচি। যদি কেহ শূদ্রের অন্ন ভোজন করেন তবে তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অহোরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্য ভক্ষণ করলে শুদ্ধ হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ এই প্রকার স্নান, জপ ও দিনান্তে ভোজন করলে শুদ্ধ হন। মক্ষিকা ও কেশযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করলে বমন ক্রিয়াদ্বারা শুদ্ধ হতে হয়। হস্ত তলে, অঙ্গুলিতে বা বাহুতে কোন দ্রব্য রেখে ভোজন করলে জলপান দ্বারা শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পীড়াবশিষ্ট কোন ব্যক্তির জলপান করলে মদ্যপানতুল্য পাপ হয়। তাছাড়া বাম হাতে জলপানেও ঐ প্রকার পাপ হয়। চর্ম মধ্যগত জলপান করা অশুচি। কোন অন্ত্যজ জাতি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করলে সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করতে হয়। শূদ্রের গৃহে অন্ত্যজজাতি প্রবেশ করলে প্রাজাপত্য ব্রত পালন করে শুদ্ধ হতে হয়। অন্ত্যজজাতি গৃহে ঢুকলে বা তিনি তার ঘরে অন্নভোজন করলে তাঁকে কৃচ্ছার্দ্ধ ব্রতচারণ করতে হয়। রজক, নট, বেণু ও চর্মকারের গৃহে যদি কোন ব্রাহ্মণ ভোজন করেন তবে তাঁকে চান্দ্রায়ণ-ব্রত পালন করে শুদ্ধ হতে হয়। অজ্ঞানতাবশতঃ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কুপে বা ভাণ্ডে জলপান করলে সান্তপণ-ব্রত করতে হয়। বৈশ্য ঐ প্রকার করলে তাকে অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শূদ্র অজ্ঞানতাবশতঃ অন্ত্যজজাতির গৃহে ভোজন করলে ব্রাহ্মণের চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অন্ত্যজজাতির স্ত্রী-গমন করলে কৃচ্ছ্রত্রয়

প্রায়শ্চিত্ত; ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মত জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করলে চান্দ্রায়ণ, অন্ত্যজগৃহে জলপান করলে ব্রাহ্মণের ছয় রাত্র, ক্ষত্রিয়ের চার রাত্র, বৈশ্যের দুই রাত্র উপবাস; ক্ষত্রিয় অজ্ঞানে চণ্ডালান্ন ভোজন করলে সান্তপণ ব্রত, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যথাক্রমে ছয় রাত্র, ত্রি রাত্র উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক বৃক্ষে অবস্থান করে ফল ভক্ষণ করলে ব্রাহ্মণকে অহোরাত্র উপবাস করে শুদ্ধ হতে হয়। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট মুখে চণ্ডাল স্পর্শ করে ফেললে সেই ব্রাহ্মণকে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী, শত সংখ্যক দ্রুপদাদি মন্ত্র জপ করে শুদ্ধ হতে হয়। চণ্ডাল ও ব্যাধের অন্ন, বিষ্টা ও মূত্র স্পর্শ করলে ত্রি রাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অন্ত্যজ স্ত্রী গমন করলে বা অকামতঃ স্ত্রী গমন করলে পরাক-ব্রত পালন করে শুদ্ধ হতে হয়। অন্ত্যজজাতির কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। ব্রাহ্মণ কোন মদ্যপানের হাঁড়িতে জলপান করলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত পালন করতে হয়। ব্রাহ্মণের ভোজন সময় বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত, বাত্যাদি উপস্থিত হ'লে সেই অন্ন স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে ভোজন করলে সেই ব্রাহ্মণকে তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত ও জাতকর্ম সংস্কার করতে হয়। বশিষ্ঠমুনি এই নিয়মের প্রবর্তক। উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকে অন্য উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কুকুর, শূদ্র স্পর্শ করে কিংবা ব্রাহ্মণ যদি একাদিত্যে দু'বার ভক্ষণ করেন তবে একরাত্রি উপবাস করে পঞ্চগব্যপান করতে হয়। ব্রাহ্মণ স্ত্রীর পক্ষে প্রজাপত্য ব্রত পালন করে শুদ্ধ হতে হয়। বর্ণ সঙ্কর জাতির উচ্ছিষ্ট মুখে ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করলে সেই ব্রাহ্মণকে পঞ্চ রাত্রি উপবাস করে শুদ্ধ হতে হয়। জলধারা, ধূলি, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ কখনও দূষিত হয় না। স্ত্রীর মুখ সর্বদা শুচি। পক্ষিগণ যে ফল স্পর্শ করে তা' শুচি। বাছুরের মুখ দ্বারা স্পর্শ দুগ্ধ কোন সময় দূষিত হয় না। মৃগয়াকালে কুকুরও শুচি বলে পরিগণিত। জলে কোন অপবিত্র বস্তু পতিত হ'লে জল অপবিত্র হয় না। স্থলে অপবিত্র বস্তু থাকলেও অন্য স্থল অপবিত্র হয় না।

বরং সেই অপবিত্র স্থানে পাদ-সংযুক্ত হ'লে আচমন করে শুদ্ধ হতে হয়। যে পাত্রে সুরা স্পর্শ হয় নাই অন্য কোন প্রকারে অশুদ্ধ হয়েছে তা ভস্ম দ্বারা মার্জন করলে শুদ্ধ হয়। মূত্র আর সুরা লিপ্ত হ'লে অগ্নিতাপের দ্বারা শুদ্ধ হয়। গো, শূদ্র, কাক, কুকুর প্রভৃতি পৃষ্ট কাংস্যপাত্র ভস্মদ্বারা দশবার মাজলেই শুদ্ধ হয়। রজস্বলা নারী স্পর্শ করলে পঞ্চগব্য পান করে শুদ্ধ হতে হয়। জলবিহীন স্থানে বা চোর প্রভৃতি সমাকুল স্থানে কোন দ্রব্য স্পর্শ করে মূত্র ত্যাগ করলেও তা অপবিত্র হয় না ; সেই দ্রব্য পরে ভূমিতে রেখে শৌচ করে গ্রহণ করা যায়। চাঁচি, দধি, ক্ষীর, ঘোল, কৃশর প্রভৃতি শূদ্রের নিকট গ্রহণ করা যায়। মাংস ও মধু অন্ত্যজ জাতির কাছে গ্রহণ করা যায়। ব্রাহ্মণ, গৌড়ী, পৈষ্টী সুরাপান করলে, অগ্নিবর্ণ সুরাপান করলে, গো-মূত্র বা জল অগ্নিবৎ ফুটন্ত করে পান করলে পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। নটী, শৈনূষিকী, রজকী, বেণুজীবিনী, মাতুল কন্যা, মাতুলানী, ভ্রাতৃভার্যা, বন্ধুপত্নী গমনে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত প্রতিপালন করলে শুদ্ধ হতে পারা যায়। মাতৃস্বসার কন্যা বা নিজকন্যা গমনে কোন বিধান বিহিত হয় নাই। দ্বিজ, কুকুর, শূকরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে ষড়্ রাত্র উপবাসাত্মক ব্রত, গৃহে অগ্নিদাতা, বিষদাতা কোন অঙ্গছেদনকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সেই পাপের জন্য তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত পালন দ্বারা শুদ্ধ হতে হয়। শূদ্রের সূতকা শৌচে বা মৃতাশৌচে ভোজন করলে বৈশ্য আটশতবার, ক্ষত্রিয় পাঁচশতবার, ব্রাহ্মণ শতবার, গায়ত্রী জপ করে শুদ্ধ হবে। জনন ও মরণ অশৌচে ব্রাহ্মণ দশাহে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে, শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে, যজ্ঞে বা দেশান্তরে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলে সদ্য শৌচ পালন করতে হয়। ষণ্মাসের বালক মারা গেলে সদ্যঃ শুদ্ধ হয়। অবিবাহিত কন্যা অনুপনীত ব্রাহ্মণ, অজাতদন্ত এবং গর্ভস্রাব হলেও ত্রিরাত্রি অশৌচের ব্যবস্থা আছে। কন্যার জন্মে একমাস অশৌচ হয়। রজস্বলা স্ত্রী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধ হয়। দুর্ভিক্ষে,

রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশৌচে, মরণাশৌচে দানবীর, দীক্ষিত, অভিষিক্ত, ব্রত সমন্বিত প্রভৃতি ব্যক্তির দানধর্মাদি নিয়মভঙ্গ হলেও কোন দোষ হয় না।

এই প্রকার আরো অনেক অশৌচের বিবরণ রয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত বিধিও প্রদত্ত রয়েছে। বাহুল্য ভয়ে আর বেশী প্রদত্ত হ'ল না।

পাপজ কর্মফল ও নরক পরিচয়

গরুড়-পুরাণের মতানুসারে পাপী ব্যক্তি কর্মফল ভোগের জন্য হীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে পাপ ক্ষয় করে থাকে। যেখানে রয়েছে ব্রহ্মহত্যাকারীকে নরকভোগের পর কুকুর, উষ্ট্র, গর্দভ ও ভেক এবং পরিশেষে পেচকরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। সুবর্ণ চুরি যে ব্যক্তি করে তাকে সেই চৌর্য কর্মের ফলস্বরূপ কৃমি কীটরূপে জন্ম নিতে হয়। গুরুপত্নীগামী ব্যক্তিকে তৃণাদিরূপে জন্ম নিতে হয়। তাছাড়া ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং স্বর্ণ চুরি যাঁরা করেন তাঁরা শ্যামদন্ত, গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি কুনখী হয়ে থাকে। অন্ন-হরণ ব্যক্তি পরজন্মে রুগ্ন বা আহারে অক্ষম হয়। মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে পরজন্মে বোবা হতে হয়। ধান্যাপহরণ ব্যক্তি অধিকাঙ্গ হয়। খল ব্যক্তির নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। তৈলাচার ব্যক্তি তৈলকীটরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে। সূচক ব্যক্তির মুখে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। কন্যাহরণকারী ব্যক্তি ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে বনে বাস করে। রত্ন চুরি করলে হীন জাতিরূপে জন্ম-গ্রহণ করে। পত্র, শাক ইত্যাদি বস্তু হরণ করলে ময়ূর, গন্ধক হরণ করলে ছুঁচো, ধান্য হরণ করলে মূষিক, ফল হরণ ব্যক্তি বানর, পশু-হরণ করলে ছাগরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এইরূপে দুগ্ধ, মাংস, বস্ত্র, লবণ হরণ করলে যথাক্রমে কাক, গৃধ্র, নেত্ররোগ হয়ে থাকে। লবণহরণকারী ব্যক্তির জন্মে জন্মে ছিন্নবস্ত্র ছাড়া ভাল বস্ত্র ভাগ্যে জোটে না। কর্মানুসারে পাপের ফল তির্যকযোনিতে জন্ম নিয়ে শাস্তি নিতে হয়। আর যাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট, দরিদ্র এবং পুরুষাধম ব্যক্তিরা নিষ্পাপ হয়ে শ্রেষ্ঠ যোগিকুলে জন্ম নিয়ে সুলক্ষণযুক্ত ও ধনশালী হয়ে থাকে।

এ সম্বন্ধে এই পুরাণের আরো প্রসঙ্গ হয়েছে। নৈমিষারণ্যে একদিন শৌনকাদি মহর্ষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'ব্যাসদেবের

কৃপায় আপনি যখন সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন তখন আমাদের কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে সন্দেহ আছে তার উত্তর দিয়ে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। জীব দেহত্যাগ করলে কেহ কেহ বলে থাকেন যে, সে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেহ তৈরী করে নেয়, জলৌকা যেমন এক তৃণ পরিত্যাগ করে অন্য তৃণ আশ্রয় করে। আবার কেহ কেহ বলেন জীবাত্মাকে দেহত্যাগ করলে যম-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এ দুটির কোন্‌টি সঠিক তা' আমাদের বলুন। তখন সুত বললেন—"হে মহর্ষিগণ এই প্রশ্ন যথার্থ করেছেন। পরলোকের কথা আমার কাছে শ্রবণ করলে আর কোনও দ্বন্দ্বই থাকবে না। কৃষ্ণগরুড় সংবাদে এই প্রশ্নেরই উত্তর রয়েছে তা' শুনলেই সব অজ্ঞানতার অবসান হবে। একবার গরুড় সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণের জন্য বের হলেন। এই বিরাট জগতের স্বর্গ-মর্ত-পাতাল সমস্তই ভ্রমণ করে কোথাও শান্তি না পেয়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন। সেখানে ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করে নমস্কার করলেন। শ্রীহরি তখন তাকে এতদিনের অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে গরুড় বললেন, 'আমি ত্রিলোক ভ্রমণ এবং ভূলোক হতে সত্যলোক পর্যন্ত পরিভ্রমণ করলাম, একমাত্র যমলোক দর্শন হয় নাই। ভূলোকে জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ, সেখানে একসঙ্গে ভোগ ও মুক্তির ক্ষেত্র বলা যায়। দেবতারা তাই বলেন, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ বড় সৌভাগ্য। এখন আপনি বলুন কিজন্য মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে, কি কারণেই বা পতিত হয়, কি কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার ইন্দ্রিয়সকল কোথায় যায় অস্পৃশ্যই বা হয় কেন? মরণের পরও জীব কর্মফল কি করে ভোগ করে? মৃত ব্যক্তিকে ভূমিতে স্থাপন করে কেন? তার মুখে পঞ্চরত্ন দেওয়ার প্রথা কেন? কুশোপরি স্থাপন করে কেন? দক্ষিণ দিকে পদদ্বয় স্থাপনের কারণ কি? মৃত্যুর সময় পুত্র-পৌত্রগণ কেনই বা সামনে থাকে, মৃত্যুকালে গো-দানের ব্যবস্থা কেন? আত্মীয়-বন্ধুদের নিকট পরিহার প্রার্থনার কারণ কি? তিল, লৌহ,

স্বর্ণ, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য ভূমি, গো-দানই বা কেন? প্রাণীরা মরে কেন? আর মরণের পর কোথায় যায়? আতিবাহিক দেহ কোথায় থাকে? পুত্রেরা মৃত শবকে কাঁধে করে বহন করে কেন? অগ্নিই বা প্রদান করা হয় কেন? ঘৃতদ্বারা শবদেহ মালিশ করা হয় কেন? হোমক্রিয়াই বা কিজন্য? ভূমি স্পর্শ, স্ত্রী শব্দ ও কীর্তন, উত্তরদিকে যমসূক্ত পাঠ কেন? মৃত ব্যক্তিকে তিলজল প্রদান কেন? সূর্য দর্শন, যব, সরিষা, দূর্বা, নিমপত্র স্পর্শের কারণ কি? শবদেহ সৎকারের পর উর্ধ্ববাস ও অধবাস পরিধানের কারণ কি? শবদেহ সৎকার করে আসার পর কারও সঙ্গে ভোজন করা নিষেধ কেন? প্রেতের উদ্দেশ্যে নয়টি পিণ্ড দেওয়ার নিয়ম কেন? চত্বরোপরি মাটির পাত্রে দুগ্ধ ও জল দেওয়ার নিয়ম কেন? রজ্জুদ্বারা তিনখণ্ড কাষ্ঠ একত্র বন্ধন করে চতুষ্পথে স্থাপনপূর্বক এক বৎসর প্রতি রাত্রিতে প্রদীপ দানের কারণ কি? আতিবাহিক দেহের উদ্দেশ্যে নয়টি পিণ্ড কেন দেওয়া হয়? মৃত ব্যক্তিকে পিতৃপুরুষ কল্পনা করে শ্রাদ্ধ করার প্রথা কেন? আতিবাহিক দেহীর আবাহন কি করে করা হয়? প্রেত-দেহের মুক্তি ও পিতৃলোক প্রাপ্তির জন্য যখন এই সকল অনুষ্ঠান করা হয় তখন আবার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা কেন? মানব অনিত্য, কোন দ্বার দিয়ে জীবদেহ হতে বের হয়ে যায়? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—দেহের এই পঞ্চভূত, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েরা প্রাণাদি বায়ু-সকল কেমন করে দেহ হতে বের হয়ে যায়? শরীরের মধ্যে যে লোভ, মোহ, তৃষ্ণা, কাম, অহঙ্কার প্রভৃতি আছে তাহারা কোথায় যায়? দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হ'লে পাপপুণ্য কোথায় যায়? সম্বৎসরান্তে সপিণ্ডের প্রথা কেন? সপিণ্ডের পর প্রেতব্যক্তি কোথায় মিলিত হয়? মূর্চ্ছা হয়ে যাদের মৃত্যু হয় তাদের অন্ত্যেষ্টির কি নিয়ম? মরণের পর যাদের দাহক্রিয়া হয়েছে আর যাদের হয় নাই, মাটিতে যাদের প্রোথিত করা হয়েছে তাদের গতি কি প্রকার? যারা পাপী, দুরাচার, বিকৃতবুদ্ধি,

আত্মঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, চোর, বিশ্বাসঘাতক, যে শূদ্র কপিলাগাভীর দুগ্ধ পান করে, প্রবন উচ্চারণ করে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করে তাদের গতি কি প্রকারের? শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের ভার্যা গ্রহণ করে তবে তার গতি কি? ইহা ছাড়া আমি এই জগৎ পরিভ্রমণ করে দেখলাম যে লোকসকল দুঃখে নিমগ্ন, তা দেখে আমার চিত্তেও দুঃখের উদয় হ'ল। স্বর্গেও দেখলাম সুখ নাই—অসুরদের ভয়ে দেবতারাও ভীতি-জনক দুঃখভোগ করছেন। ভূমণ্ডলে রোগ-শোক মৃত্যু প্রভৃতির ভয়, আর পাতালেও ভয়। আপনার শ্রীপাদ ভিন্ন কোথাও ভয়শূন্য দেখছি না। সকল স্থানেই মিথ্যা এবং কাল কবলিত। তার উপর আবার ভারতবর্ষ অধিক দুঃখজনক স্থান। সেখানকার মানুষ রাগদ্বেষে পূর্ণ, তাছাড়া অনেকে অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে দুঃখভোগ করছে।' এমনি অনেক প্রশ্ন উত্তোলন-পূর্বক তার নিরসনের জন্য উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শ্রীভগবান গরুড়ের এই উত্তম প্রশ্ন শুনে বললেন—'যা ইন্দ্রাদি দেবগণ, যোগীগণের অজ্ঞাত তত্ত্ব তা তুমি শুন। কারণ তুমি প্রকৃতই ভক্ত, তাই তোমাকে পরলোকের সম্পর্কে বিস্তৃত বলছি। অপুত্রক ব্যক্তির কোন গতি নাই। সেজন্য পিতার ঊর্ধ্বদৈহিক কাজ করা প্রয়োজন। সেই কর্ম যে কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হ'লে পিতৃলোকবাসীর মুক্তি না হলেও নরক হতে মুক্তি যে পাবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। পিতার শবদেহ স্কন্ধে বহন করা পুত্রের কর্তব্য, পৌত্রের কর্তব্য মুখাগ্নি করা। ভূমিতে তিলদর্ভ সহযোগে শবদেহ রাখার নিয়ম। তাতে বাড়ী ঋতুমতী হয়। মুখে পঞ্চরত্ন দেওয়ার যে বিধি তাতে জীব প্ররোহ হয়। যদি ঋতুপুষ্প বিনষ্ট হয় তবে গর্ভ ধারণে অক্ষম হয়—অর্থাৎ বংশনাশ হয়ে থাকে। বংশনাশ হ'লে পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য ভূতলে আবার জন্ম নিতে হয়। গোময় দ্বারা ভূমি লেপন করে কুশ তিল প্রভৃতি অস্তরণ করে তবে তার উপর রোগীকে শায়িত

করতে হয় তাতে দৈহিক সর্ববিধ পাপ মুক্ত হয়। দর্ভতূলির উপর রোগীর প্রাণবিয়োগ হ'লে তার স্বর্গবাস হবে। সেই তূলি বা কুশ শ্মশানে পরিত্যাগ করার নিয়ম। বসুধা প্রলিপ্ত স্থান ব্যতীত সর্বত্র পবিত্র। অপ্রলিপ্ত স্থানে যদি রোগীর দেহত্যাগ হয় তবে পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষসাদিতে আবিষ্ট হয়ে নিম্নযোনির গতি হয়। নিত্য হোম, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণকে পাদ্য অর্ঘ্য দান, মণ্ডলহীন ভূমিতে প্রাণত্যাগ আবার জন্মের কারণ। মণ্ডলের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতারা অধিষ্ঠান করেন। সেজন্য মণ্ডলের মধ্যে বালক, যুবা, বৃদ্ধ যারই মৃত্যু হয় তার নিম্নযোনি স্বরূপ গতি হয় না। সে বায়ুভুত হয়ে বায়ুতেই খেলা করে। তার শ্রাদ্ধ তর্পণ নাই। তিল আমার স্বেদে উৎপন্ন তাই ইহা পবিত্র। সেজন্য তিলের ভয়ে দৈত্য-দানবরা দশদিক হতে পালিয়ে যায়। তিল কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ। ইহা গোমূত্রে উৎপন্ন হয়। ইহা শরীরের পাপরাশি নাশক। তর্পণে, দানে আমাকে একটি মাত্র তিল প্রদত্ত হ'লে হেমদ্রোণ তিলদানের ফল লাভ হয়। আমারই রোমে দর্ভ ও স্বেদে তিল উৎপন্ন হয়েছে। শ্রাদ্ধে তিলকুশ ব্যবহার করলে দেবতা ও পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হয় এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কুশের মূলে ব্রহ্মার বাস, মধ্যভাগে জনার্দনের বাস, অগ্রভাগে শঙ্কর বাস করেন। এই তিন দেবতার বাস কুশে। বিপ্র, মন্ত্র, কুশ, অগ্নি, তুলসী ক্রিয়ার নিমিত্ত বার বার ব্যবহৃত হলেও ইহারা কখনও অপবিত্র হয় না। সেজন্য তুলসী, ব্রাহ্মণ, গো, বিষ্ণু ও একাদশী ভবসাগর পাড়ি দেওয়ার নৌকা সদৃশ। বিষ্ণু, একাদশী, গীতা, তুলসী, বিপ্র, ধেনু এই ছয়টি সংসারের মুক্তিস্বরূপ। হাত দিয়ে কুশ তুলে জলময় করে ভূমিতে স্থাপন করতে হয়। কুশ শয্যায় যদি কেউ প্রাণত্যাগ করে তবে সে মন্ত্রহীন হলেও বিষ্ণুলোক লাভ করবে। দর্ভতূলীতে শয়ন করে পাদদ্বয় যদি ধরণীর উপর রক্ষিত হয় তবে উহা পাপনাশক। গোময় লিপ্ত ভূমিতে কুশাসনের উপর

অবস্থান করে, যদি কেহ দান করেন তাহলে তার পাপ বিনাশ হয়ে যায়। লবণ রসকেই দিব্যরস বলা হয়। ইহা সর্ব কামপ্রদ। লবণ বিনা কোন অন্ন রসই সমধিক প্রিয় নয়। এই লবণ রস বিষ্ণুদেহ হতে উৎপন্ন হয়েছে। এজন্য লবণ জলই স্বর্গপ্রদ। এইজন্য লবণ দানই শ্রেষ্ঠ দান বলে থাকেন দেবতারা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি যে কোন ব্যক্তিই হোক্ না কেন যদি রোগের জন্য প্রাণ বহির্গত না হয় তবে ভূমিতে শায়ন করিয়ে লবণ দানের ব্যবস্থা করতে হয়। এই লবণ দান দ্বারা পরলোকের দ্বার উন্মুক্ত হয় বলে প্রাণত্যাগ করে রোগী। কাল মৃত্যুরূপী, মৃত্যু জীবের বিস্মৃতিরই নামান্তর। বায়ু যেমন জলকে আকর্ষণ করে কাণ্ড কাল ও জীবসকলকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ এক দেহ হতে অন্য দেহে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সমস্ত ভাবই কালাধীন। এই গুণ সকলই, জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আদিত্য, চন্দ্র, শম্ভু, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, ঔষধী প্রভৃতি কালের মধ্যেই অধীন। এই সকল কালকর্তৃক সৃষ্টি এবং লয় হয়। কাল যখন তাকে সংহার করবে তখন সামান্য কোন পথ্যকে উপলক্ষ্য করে ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং তাতে ইন্দ্রিয় বিকলতা ও ওজঃ ধাতুর হানি হয়ে থাকে। শত শত বৃশ্চিকের যেমন দংশনপীড়া তেমনি যদি কারো হঠাৎ অনুভব হয় তবে তার মারাত্মক রোগ হবে জানতে হবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়লে যমদূতেরা তাদের শক্তি প্রয়োগ করে পঞ্চপ্রাণকে আকর্ষণ করে নেয় তখন রোগীর অবস্থা বড়ই বীভৎস রূপ নেয়; প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, মুখে লাল উৎগীরিত হয়, তখন সে ভয়ে হাহাকার করতে থাকে। তখন সেই জীবের হৃদয়ে যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ থাকেন তাকেই নিয়ে যমদূতেরা যমলোকে গমন করেন। হে গরুড় আরেক প্রকার মৃত্যুর কথা তোমায় জানাচ্ছি। প্রকুপিত বায়ু দৈহিক উষ্মা দেহের মর্মস্থানগুলি ভেদ করে। উষ্মা প্রবল হ'লে দেহ ধাতু শোষণ

করে মর্মভেদ করে। তখন উদান বায়ু উর্ধ্ব মুখী হয়। ভুক্ত অভুক্ত দ্রব্য অধোগতি পথ রুদ্ধ হ'লে প্রাণবায়ু প্রবলাকার ধারণ করে। আর যারা আস্তিক্য বুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান—তাদের সুখে মৃত্যু হয়। কাম, ক্রোধ ইত্যাদিতেও যারা ধর্মত্যাগ করে না তারা সুখে মৃত্যু গ্রহণ করে। শাস্ত্রভিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারীর সুখে মৃত্যু হয়। যারা অপরকে মোহজ্ঞান দান করে, তারা মৃত্যুকালে অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয়। যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, বিশ্বাসঘাতক, বেদ নিন্দুক—তারা মৃত্যুর সময় জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়ে। তেমনি ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ভীষণাকার যমদূতের আগমন ঘটে। তাদের দর্শন মাত্রেই সেই মৃতব্যক্তি ভীত হয়। সে তখন পিতামাতাকে স্মরণ করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে মুখে আর কোন বাক্যের স্ফূর্তি হয় না। ভয়ে চক্ষু ঘোরে, মুখ শুকিয়ে যায়। ভীতির জন্য প্রাণ ত্যাগ করে। সেই দেহ তখন অস্পৃশ্য হয়।

এইবার জগতের বৈচিত্র্য বিষয়ক ঘটনা শ্রবণ কর। পূর্ব কর্মের হেতু তার ভোগেরও তারতম্য হয়ে থাকে। দেবত্ব, অসুরত্ব, যক্ষত্ব ইত্যাদিতে জন্ম সুখজনক। মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব দুঃখজনক। কর্মভেদে এই প্রকার জন্মভেদ ও ফলভেদ। এখন কর্মবৈচিত্র্যের বিষয় বলছি। কর্মবশে জীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। মহাপাতক ব্যক্তি ঘোর নরকে জন্মগ্রহণ করে। যেমন ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি মৃগ, অশ্ব, শূকর, উষ্ট্রযোনি প্রাপ্ত হয়। স্বর্ণঅপহারী ব্যক্তি ক্রিমিকীট, পতঙ্গযোনি, স্বর্ণচৌরের কুনখী হয়। যারা মহাপাতক তাদের সঙ্গ করলে সে পাপ তাকে আক্রমণ করে। যেমন পতিত ব্যক্তির সঙ্গে সংবৎসর সহবাস করলে পতিত হতে হয়। পরস্পর কথা বলা, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একাসনে বা এক শয্যায় উপবেশন, অধ্যাপন এবং বিবাহরূপ যৌন সম্বন্ধ প্রভৃতি করলে পরস্পরের পাপ সংক্রামিত হয়। পরদার গমন করলে ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। রত্ন চুরি করলে নিকৃষ্ট যোনিতে, বৃক্ষ চুরি করলে

পক্ষী, গন্ধক হরণ করলে ছুঁচো প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হয়। গৃহের সরঞ্জাম চুরি করলে গৃধ্র, মধু হরণে দংশ, গো হরণে গাধা, অগ্নি হরণে বক, বস্ত্র হরণে শ্বেতকুষ্ঠ, রস চুরি করলে অরুচি, কাংস্য চুরি করলে হংস, পরস্ব হরণে কুকুর জন্ম হয়। মন্ত্রহীন ভোজনে কাক, গুরুঘাতী অপস্মার রোগ, ক্রূরকর্মকারী বামন আর ধর্মপত্নী ত্যাগ করলে বোবা হতে হয়। দেবস্ব ও বিপ্রস্ব সম্পত্তি চুরি করলে পাণ্ডুবর্ণ ক্রিমি জন্ম হয়। অভক্ষ্য যদি ভক্ষণ করা যায় তবে গণ্ডমালা মহারোগ হয়। স্থাপ্য ধন হরণে অন্ধ হয়। স্ত্রী দ্বারা জীবিকা প্রতিপালন করলে খঞ্জ হতে হয়। কৌমার অবস্থায় স্ত্রী ত্যাগ করলে দুর্ভোগ হয়। একাকী মিষ্টান্ন ভক্ষণ করলে বাত হয়, ব্রাহ্মণী গমন করলে জম্বুক হয়, শয্যাহারী ব্যক্তি নাস্তিক সন্ন্যাসী, বস্ত্রহারী পতঙ্গ, মাৎসর্যশীল জন্মান্ধ, মিত্রভেদকারী ব্যক্তি পেচক, গুরুজন নিন্দুক ক্ষয়রোগী, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি তোতা, মিথ্যা সাক্ষীদাতা মশক, বিবাহে বিঘ্নকারী ব্যক্তি ছিন্নোষ্ঠ, বৃষল, চত্বরে মলমূত্র ত্যাগকারী ব্যক্তি মূত্রকৃচ্ছ, কন্যাদূষক ব্যক্তি ক্লীব, বেদ বিক্রয়ী দ্বীপী, অযাজ্যযাজী ব্যক্তি বরাহ, যেখানে সেখানে ভোজনকারী ব্যক্তি মার্জার, বনদাহকারী খদ্যোত, পুর্যুষিতভোজী ক্রিমি, মৎসীর ব্যক্তি ভ্রমর, অগ্নিদাতা ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী, অদত্ত দ্রব্য যে দান করে বৃষ, গো-হরণকারী সর্প, অন্নোপহারী ব্যক্তি অজীর্ণ, জলাপহারী মৎস্য দুগ্ধহরণকারী হংস, ব্রাহ্মণকে পর্যুসিত ভোজনকারী ব্যক্তি কুব্জ, ফল হরণকারীর বংশনাশ, উৎকৃষ্ট খাদ্য গুরুজনদের না দিয়ে ভক্ষণ করলে বংশ নাশ, অবিধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মরুভূমি, জলাপহারী চাতক, ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য দান না করলে জম্বুক, দ্বিজাতিগণের প্রতিবাদকারী কচ্ছপযোনি, ফল বিক্রেতা দুর্ভগ, ব্যাভিচারিণীর পতি-বৃক, পদদ্বারা অগ্নিস্পর্শকারী মার্জার, পরকীয় মাংস ভক্ষণকারী রোগী, জল-প্রসরণ ভঙ্গকারী মৎস্য, হরিকথা ও সাধুজনের স্তুতিতে অভিনন্দন যে না করে তার কর্ণমূলরোগ, পরের আহার গ্রহণ করলে গণ্ডমালা,

যে দম্ভসহকারে ধর্ম আচরণ করে তার গাত্র গজ চর্মবৎ, বিশ্বাসঘাতকের শিরঃপীড়া, শিবনির্মাল্য হরণ করলে লিঙ্গপীড়া—এমনিভাবে পাপের ফল নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিজ নিজ পাপের ফলস্বরূপ প্রতি জীবের জন্মকর্মে বৈচিত্র্যতা। নরকের আরো কিছু বিবরণ পাওয়া যায় এই পুরাণে। রৌরব নরকের নামে নরক আছে। এই নরকটি সমস্ত নরকের মধ্যে সর্বপ্রধান হিসাবে পরিগণিত। এই নরকে বিশেষতঃ যারা মিথ্যা সাক্ষী, অসত্য মিথ্যাবাদীরাই পতিত হন। এই নরকের আয়তন হ'ল দুই সহস্র যোজন। এই নরকে হাঁটু পরিমাণ গর্তে অগ্নি প্রপুরিত বা অঙ্গাররূপী অগ্নি ঐ কুণ্ডে সদা প্রজ্বলিত থাকে। যমদূতেরা পাপী ব্যক্তিদের ঐ কুণ্ডে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় তখন তারা অত্যন্ত অগ্নিতাপে শরীরের অঙ্গ সকল দগ্ধ হতে থাকলে যন্ত্রণায় ছটফট করে। অগ্নিতাপে ছটফট করতে করতে সে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। কখনও কুণ্ড হতে উঠে পড়ে যায় আবার উঠে চলতে থাকে। এইভাবে সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করলে, তখন তাকে সেই নরক হতে অন্য নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রৌরব নরকের পর মহারৌরব নরক। এই নরকটি চারদিকে পাঁচ সহস্র যোজন ব্যাপী আয়তন। সেখানকার ভূমি তাম্রময়। আগুনের তাপে সেই তাম্র বিদ্যুৎ সদৃশ হয়ে আছে। যমদূতেরা পাপীষ্ঠ ব্যক্তিদের হাতে পায়ে বেঁধে ঐ মহারৌরব নরকে ফেলে দেয়। পাপীরা ঐ নরকে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। ঐ অবস্থায় আবার সেখানকার কাক, বক, উল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করতে থাকে। পাপী ব্যক্তি ঐ অসহ্য যন্ত্রণায় 'হা বাবা', 'হা মা' করে চিৎকার করে। কিন্তু একবিন্দুও যন্ত্রণার শান্তি হয় না। এই নরকে অযুতাযুত বৎসর কাটলে তখন নিস্তার পায়।

তৃতীয় নরক—অতিশীত। এখানের আয়তন হ'ল ঐ মহারৌরবের মতই। এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত শীতল বলে পাপীরা শীতে

কষ্টানুভব করে। যখন ঐ শীত অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তখন পাপীরা পরস্পর আলিঙ্গন করে আরাম পাওয়ার চেষ্টা করে। এখানকার শীত এত বেশী যে দাঁতসকল খসে পড়ে যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হাহাকার করে। তাছাড়া মাঝে মাঝে বায়ু প্রবাহের সঙ্গে বরফের বড় বড় খণ্ড এসে পাপীদের উপর পতিত হয় এবং বরফ খণ্ডের আঘাতে দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। এমন ক্ষুধার উদ্রেক হয় যে সেখানে গলিত পচিত ব্যক্তির দেহের মাংসও ভক্ষণ করতে পাপীরা এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না।

চতুর্থ নরকের নাম—নিকৃন্তন। এখানে কুম্ভকারের চাকা বিশিষ্ট চক্র আছে। কালের দ্বারা সেই চক্র বাঁধা। এই চাকায় পাপীদের বেঁধে ঘুরানো হয়। পাপীদের দেহ ঐ চাকায় ঘুরতে ঘুরতে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হলেও আবার দেহখণ্ডগুলি একত্র সংযোগ হয়ে যায়। এইভাবে বার বার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয় আবার একত্র হয়—নিকৃন্তন নরকে এই ক্লেশভোগ হয়। সহস্র বৎসর এইভাবে কষ্টভোগ করলে পাপীদের মুক্তি হয় ঐখান হতে। তারপর অপ্রতিষ্ঠ নরক। এই নরকেও চক্র সকল বিদ্যমান। ঘটীবৎ চক্র আছে। এই চক্রে পড়ে কেউ শুধু ঘুরতে থাকে। কেহবা ঘুরতে ঘুরতে রক্ত বমি করে, পেটের নাড়ীভুরি মুখ দিয়ে বের হয়, চোখ বের হয়ে পড়ে, এমনি-ভাবে সেখানে কষ্টভোগ করে পাপীরা।

এরপর অসিপত্রবন নামক নরক। এই নরকের আয়তন সহস্র যোজন। এখানেও পাপীরা অতীব কষ্টভোগ করে। এখানে পড়লে পাপীদের পা শীতল হয়ে পড়ে তাতে তারা চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে। সেখানকার হিংস্র বাঘ, কুকুরগুলি সদাই আহার লোভে ঘুরে বেড়ায়। পাপীরা যখন যন্ত্রণায় 'বাবা', 'মা' বলে চিৎকার করে তখন ঐ হিংস্র জন্তুগুলি তাদের ভক্ষণ করে।

'তপ্তকুম্ভ' নামক নরকও রয়েছে। এই নরকের চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করা কুম্ভ আছে। এই কুম্ভগুলি তপ্ত তৈল আর লৌহচূর্ণে

পূর্ণ। যমদূতেরা পাপীদেরকে নিম্নমুখী করে ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ করে। তাতে শরীরের মাংস রক্ত মজ্জা জ্বলতে থাকে। কপাল, নেত্র, অস্থি সেই অবস্থায় স্ফুটিত হয়। হিংস্র জন্তুরা তখন সেই পাপীদের ভক্ষণ করতে থাকে। কাহাকেও আবার তৈলে ছেড়ে দেয় তাতে আবার দগ্ধ হয়ে ভর্জিত হতে থাকে। তখন যমদূতেরা একপ্রকার ঘৃতরূপ দ্রব্য দিয়ে পাক করতে থাকে। পাপীদের এইভাবে শাস্তি দিয়ে তবে অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। রৌরব, মহারৌরব, অতি শীত, নিকৃন্তন, অপ্রতিষ্ঠ, অসিপত্রবর্ণ তপ্তকুণ্ড প্রভৃতি নরকের মধ্যে প্রধান। আরো অনেক নরক রয়েছে—রোধ, শূকর, তাল, তপ্তখল্ব, মহাজ্বাল, শবল, বিমোহন, ক্রিমিভক্ষ, লালভক্ষ, বিমক্ষণ, অধঃশির, পূয়বহ, রুধিরান্ধ, বিড়্ভুজ, বৈতরণী, মূত্রকুণ্ড, অগ্নিজাল, করপত্রবন, মহাঘোর সন্দংশ, শ্বভোজন, তমঃ, কালসূত্র, লোহতাপী ভেদন, অপ্রতিষ্ঠ, অবীচি প্রভৃতি।

এইবার কোন্ কোন্ পাপের ফলে কোন্ কোন্ নরকে গতি হয় তার উল্লেখ রয়েছে। যত গোঘ্ন, ভ্রূণ হত্যাকারী, অগ্নিদাতা ব্যক্তি রোধ নরকে, ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি শূকর নরকে, সুরাপায়ী, স্বর্ণচোর ব্যক্তি সুরাপ নরকে, ক্ষত্রিয় হন্তা, বৈশ্য হন্তা, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি তপ্তখল্ব নরকে পতিত হয়। স্বস্থগামী, রাজরক্ষী পুরুষ প্রভৃতি তপ্তলোহে পতিত হয়। নিষিদ্ধ দ্রব্য যারা বিক্রয় করে, অন্যায়ভাবে কাকেও বাদী করলে, প্রস্তুত অন্ন অহংকার বশে পরিত্যাগ করলে মহাজ্বাল নরকে পতিত হতে হয়। কন্যা, পুত্রবধূগামী, বেদ বিক্রয়ী গুরুর অবমাননাকারী পরের মনে বাক্যদ্বারা ব্যথা দানকারী, অগম্যাগামী প্রভৃতি ব্যক্তিসকল শবল নরকে পতিত হয়। যুদ্ধের সময় যারা নিয়মভঙ্গ করে তারা বিমোহ নরকে পতিত হয়। পরের যারা অনিষ্ট করে তারা ক্রিমি ভক্ষণ নরকে গমন করে। দেবতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিদের যারা দ্বেষ করে তারা লালাভক্ষ নরকে পতিত হয়। পরনারীর পতি বর্তমান থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি পুত্র উৎপাদন করে, স্ব-ব্যবসা পরিত্যাগপূর্বক কুম্ভকার ব্যবসা

যে গ্রহণ করে, স্থাপ্যধনহর্ত্তা প্রভৃতি ব্যক্তি বিমক্ষণ নরকে পতিত হয়। অযাজ্যযাজক, অসংপ্রতিগ্রহী ব্যক্তিকে আকাশে যতদিন নক্ষত্র বর্তমান থাকে ততদিন অধোমুখে নরকে কাল কাটাতে হয়। ক্ষীর, মদ, মাংস, লাক্ষা, গন্ধদ্রব্য, রস, তিল বিক্রয়কারী ব্যক্তি পূয়বহনরকে বাস করে; কর্কট, মার্জার, শূকর, পক্ষী, মৃগ, ছাগ এই সমস্ত জন্তুদের বন্ধন করে যারা পীড়া দেয় তারা ঐ নরকে পতিত হয়। জাগমেষাদি পশুপালক, মহিষজীবি, চক্রজীবি, ধ্বজজীবি, রঙ্গো, পজীবি, গণনাজীবি, গ্রামযাজী, গৃহদাহকারী, বিষপ্রয়োগকারী, সোম বিক্রেতা, মদ্যপায়ী, মাংসভোজী, পশুঘাতী প্রভৃতিকে রুধিরাম্ভ নরকে পতিত হয়ে কষ্টভোগ করতে হয়।

যারা এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতে বসে অপরকে বিষ ভোজন করায় তারা বিড়্‌ভূজ নরকে গমন করে।

মধুচোর বৈতরণী নরকে, অপরের পতি আক্রোশকারী ব্যক্তি মূত্র-কুণ্ড, ক্রোধন ব্যক্তি করপত্রবনে, মৃগহিংসক ব্যক্তি অগ্নিজ্বাল নামক নরকে পতিত হয়ে যন্ত্রণাভোগ করে। যজ্ঞে যারা জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াকে সংক্ষেপ করে তাদের সন্দংশ নামক নরকে গতি হয়। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর নিদ্রাকালে শুক্রস্খলন হ'লে, পুত্রের কাছে পাঠ, পুত্রের আদেশ পালনে পটু, তারা স্বভোজ নরকে গমন করে। অহংকারের বশবর্তী হয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করে, তারাও ঐ নরকে গমন করে। সমস্ত নরকের শীর্ষে উষ্ণ রৌরব নামক নরক, তার নিচে মহা-রৌরব, তার নীচে অতিশীত নরক। এইভাবে নরক সকল অবস্থিত রয়েছে। যে যেমন কর্ম করবে তার গতি হবে তেমনি নরকে। দেবতারা নিম্নস্থ নরকগুলি দর্শন করতে পারেন। আর নরকস্থ ব্যক্তিরাও উর্ধ্বে দেবতাদের দেখতে পান। ইহা ছাড়া শত সহস্র নরক আছে। এই সকল নরকে পাপী ব্যক্তিরা দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে তারপর ক্রিমি-কীট পতঙ্গ, পশুযোনি প্রভৃতি নিম্নতন যোনি প্রাপ্ত হয়। বন্যপ্রাণী-রূপেও কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করে থাকে। গর্ধব, অশ্ব, গরু, অশ্বেতর,

শরভ ও চমরী নামক ছয় রকম প্রাণীরূপে পাপীরা জন্মগ্রহণ করে। তাছাড়া পঞ্চনখাদি যোনিরূপেও জন্মগ্রহণ করে। মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করলেও কেহ কেহ কুব্জা, বামন, চণ্ডাল প্রভৃতি রূপেও জন্ম পরিগ্রহ করে থাকে। তবে তারা কর্মফল হতে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণরূপে যেমন জন্মগ্রহণ করতে পারে তেমনি দেবত্ব অর্জন করে স্বর্গভোগও করতে পারে। পুণ্যফল ভোগের জন্য পুণ্যবান ব্যক্তিদের নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত যে স্থান — বহু অলঙ্কারে দূতেরা সজ্জিত অমল বিমানে আরোহণ পূর্বক, দিব্যগন্ধময় পরিবেশে নিয়ে গিয়ে থাকেন। সেখানে স্বর্গ-সুখভোগ শেষ হলে পৃথিবীতে উত্তম ব্যক্তিদের কুলে বা সাধুজনের বংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন এবং উত্তম উত্তম ভোগ সকল তারা প্রাপ্ত হয়।

জন্মিলে মৃত্যু অবধারিত। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর অধোমার্গে স্থান পায়। অর্থাৎ শরীরের পঞ্চভূত প্রতিটি আকাশস্থ পঞ্চভূতের সঙ্গে লীন হয়ে যায়। যেমন ভূমির সঙ্গে ক্ষিতির, জল অপের সঙ্গে, আগুন তেজের সঙ্গে, বায়ু মরুতের সঙ্গে আর দেহের আকাশ ব্যোমের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। দেহের মধ্যে যে কামক্রোধ রয়েছে তা ক্রোধ-স্বরূপ, দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই হ'ল সেই কাম ক্রোধ, অহংকার মন প্রভৃতির নায়ক। গৃহ অগ্নিদ্বারা ধ্বংস হ'লে গৃহী অন্য গৃহে চলে যায় যেমন, তেমনি জীবসকলও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত হয়ে একদেহ পরিত্যাগ করে অপর দেহে গমন করে। দেহ ধ্বংস হ'লে দেহের সঙ্গে সপ্তধাতু, ষটকোষাগুলিই বাত, পিত্ত, শ্লেষা, মূত্র, পুরীষ প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্ট মজ্জা, মাংস, অস্থি, শুক্র, স্নায়ুগুলি দেহের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আবার দেহ গঠনের সময় এগুলি সৃষ্টি হয়ে যায়।

মনু-সংহিতা মতে কর্মের ফলাফল ও গতি

কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম কৃত হয়, সেই কার্যগতি অনুসারেই লোকের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতিপ্রাপ্তি হয়। দেহীর মনকেই মনোবাক্-কায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন-প্রকার কর্মের প্রবর্তক জানিবেন। এই ত্রিবিধ কর্ম, বক্ষ্যমান দশলক্ষণ-যুক্ত। 'পরের দ্রব্য অন্যায়রূপে কি প্রকারে লইব' 'মন দ্বারা অনিষ্ট চিন্তা' 'পরলোক নাই—দেহই আত্মা'—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ, অশুভদায়ক মানসকর্ম এই ত্রিবিধ। মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরের দোষ-কথন, রাজার, দেশের বা পুরাদি সম্বন্ধীয় নিষ্প্রয়োজন অসম্বন্ধ প্রলাপ—অশুভকর বাচিক কর্ম এই চতুর্বিধ। অদত্তধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার সেবা—শারীরিক অশুভকর্ম এই তিন প্রকার। দেহী, মানস শুভাশুভ কর্মের ফল মনদ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্মের ফল বাক্য-দ্বারা এবং শরীরকৃত শুভাশুভ কর্মের ফল শরীরদ্বারাই ভোগ করে। শারীরিক কর্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনি প্রাপ্তি এবং মানসকর্মদোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহার বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিক অর্থাৎ যিনি জ্ঞান বলে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন তাঁকেই যথার্থ ত্রিদণ্ডী বলা যায়। কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া সর্বভূত সম্বন্ধে যিনি এই ত্রিদণ্ডের যথা ব্যবহার করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। যিনি এই শরীরকে কার্য করান, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এবং কর্মপ্রবৃত্ত শরীরকে পণ্ডিতেরা ভূতাত্মা বলিয়া থাকেন। * * * দুষ্কৃতকারীর জন্য পঞ্চভূতের অংশ হইতে পরলোকে আর একটি যাতনাময় দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ দেহারম্ভক ভূতের অংশে লীন থাকিয়া দুষ্কৃতিকারী ঐ শরীরদ্বারা যম-যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সে নিষিদ্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়াসক্তিদোষে যমলোকে দুঃখাদি

অনুভব করিয়া ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া ঐ উভয় মহৌজা মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করে। মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ে আলস্য-রহিত হইয়া জীবের ধর্মাধর্মের সাক্ষী থাকেন এবং ঐ ধর্মাধর্মদ্বারা জীব—ইহ ও পরলোকে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম ও অল্প অধর্ম করেন, তবে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখভোগ করিতে থাকেন। আর যদি তাঁহার অধর্ম অধিক ও ধর্মের ভাগ অল্প থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে সে হর্ম-যাতনা ভোগ করে, এরূপ একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। জীব, যমকৃত যাতনা ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর নিজকর্মানুসারে আবার ভাগমত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি দেহ ধারণ করে। ধর্ম ও অধর্মহেতুক জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সদা ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি মহত্তত্ত্ব নামক আত্মার গুণ জানিবে। এই তিনগুণ ব্যাপ্ত থাকিয়া মহত্তত্ত্ব স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থে অবস্থান করিতেছেন। এই সকলগুণের মধ্যে যে দেহে সাকল্যে যে গুণ অধিক থাকে, সেইগুণ, উক্ত দেহের দেহীকে বহু পরিমাণে আপনার লক্ষণে লক্ষিত করে। সত্ত্বে জ্ঞান, তমোগুণে অজ্ঞান এবং রজোগুণে রাগদ্বেষ লক্ষিত হয়। সর্বভূতাশ্রিত দেহ ব্যাপীয়া এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাদের গুণ এই ; আত্মাতে প্রীতিযুক্ত প্রাকাশরূপ যে বিশুদ্ধ প্রশান্তভাব অনুভব করা যায়, তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যাহা দুঃখসমাযুক্ত ও আত্মার অপ্রীতিকর এবং যাহা শরীরীগণের বিষয় স্পৃহা জন্মাইয়া দেয়, সেই দুর্নিবার গুণকে রজঃ বলিয়া জানিবে। যাহা সদসদ-বিবেক শূন্য, অস্ফুট বিষয়াত্মক অর্তকনীয় স্বরূপ ও দুর্জ্ঞেয়, তাহাকেই তমঃ বলিয়া জানিবে। * * * সাত্ত্বিকের দেবত্ব-প্রাপ্তি, রাজসিকের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ও তমোগুণীর তির্যক্‌যোনি প্রাপ্তি—লোকের এই ত্রিবিধ গতি হয়। এই যে সত্ত্বাদি-গুণনিমিত্ত ত্রিবিধা গতি উক্ত হইল—ইহা আবার সংসার হেতুভূত কর্মভেদে ও জ্ঞানভেদে

উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়। বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগ—'তমোগুণ নিমিত্ত যে গতি হইয়া থাকে, এই সকল যোনিপ্রাপ্তি তন্মধ্যে অধমশ্রেণীভুক্ত। হস্তী, ঘোটক, শূদ্র ও গর্হিত ম্লেচ্ছ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ—এই সব যোনিপ্রাপ্তি তামসী গতির মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নটাদি, পক্ষী, দম্ভভাবে কর্মাচরণকারী পুরুষ, রাক্ষস এবং পিশাচ; তমোগুণজনিত গতির মধ্যে এই সব যোনিপ্রাপ্তি উত্তম শ্রেণীভুক্ত। প্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন লগুড়াস্ত্র ঝল্ল জাতি, বাহুযোধী মল্লজাতি, নট, শস্ত্রজীবী, দ্যূতাসক্ত ও পানাসক্ত ব্যক্তি—ইহারা রজোগুণের অধমগতিভুক্ত জানিবে। জনপদেশ্বর রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজপুরোহিত এবং শাস্ত্রার্থ কলহপ্রিয় ব্যক্তিরা—রজোগণের মধ্যমগতিভুক্ত। গন্ধর্ব, গুহ্যক, যক্ষ, দেবানুচর, বিদ্যাধরাদি এবং অপ্সরা—ইহারা রজোগুণ-জনিত গতি মধ্যে, উত্তমগতিভুক্ত। বানপ্রস্থ, যতি, বিপ্র, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র ও দৈত্য—ইহারা সত্ত্বগুণের নিমিত্ত অধমগতির ফল। যাহারা যাগশীল, ঋষি, দেবতা, বেদাভিমানী বিগ্রহধারী দেবতা, ধ্রুবাদি জ্যোতিষ্ক, বৎসর, সোমপাদি পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ—ইহারা মধ্যমা সাত্ত্বিকী গতির ফল। ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি প্রজাপতি, বিগ্রহধারী ধর্ম, মূর্তিমান মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত—ইহারা সত্ত্বগুণ নিমিত্ত উত্তমাগতির ফল—ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। মনোবাক্যকায়রূপ সাধনত্রয় ভেদে তিনপ্রকার কর্মের সত্ত্ব রজ তম ভেদে ত্রিবিধগতি ও উহার আবার উত্তম মধ্যম অধমভেদে যে তিন সার্বভৌতিক সমগ্রগতি বিশেষ, ইহা সর্বতোভাবে বলা হইল। ইন্দ্রিয় বিষয়ে সর্বদা প্রসক্ত হওয়ায় এবং প্রায়শ্চিদাদি ধর্মের অনুষ্ঠান না করায়, অবিদ্বান নরাধমেরা পাপগতি প্রাপ্ত হয়। এই জীব, যে যে কর্ম দ্বারা ইহলোকে ক্রমশঃ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয় আপনাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক-কারীরা বহু বর্ষ ঘোর নরকভোগ করিয়া পাপ

ক্ষয়ে এই সকল জন্ম প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী—শূকর, কুকুর, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুক্কশ—এই সকল যোনি প্রাপ্ত হয়। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ নরকক্ষয়ে—কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠা ভক্ষক পক্ষী এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সবর্ণহারী ব্রাহ্মণ—উর্ণনাভ, সর্প, কৃকলাস, জলচর, কুম্ভীরাদি প্রাণী এবং হিংসনশীল পিশাচাদি যোনিতে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে। গুরুদারা পহারী—তৃণ, গুল্ম, লতা, আমমাংস ভক্ষক জন্তু ও দন্তুর সিংহাদি এবং ক্রূরকর্মা-ব্যাঘ্রাদির যোনিতে শতবার জন্ম গ্রহণ করে। যারা প্রাণিবধশীল – তাহারা মরণান্তে আম-মাংস-ভক্ষণকারী জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে, অভক্ষ্য—ভক্ষকেরা – কৃমি হইয়া জন্মায়, চৌররা—পরস্পরের মাংস খাদক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং অন্ত্যজাতীয় স্ত্রী গমণকারীরা—প্রেত হইয়া জন্মায়। পতিত-সংসর্গী, পরস্ত্রীগামী এবং বিপ্রস্বহারী—ইহারা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়। মনুষ্য লোভবশত মণি, মুক্তি, প্রবাল এবং বিবিধ রত্ন হরণ করিলে স্বর্ণকার—যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ধান্য চুরি করিলে ইঁদুর, কাংসহর্তা হংস, জল হরণে প্লব নামক পক্ষী, মধুহর্তা দংশ, দুগ্ধ হর্তা কাক, রসহর্তা কুকুর এবং ঘৃতহর্তা নকুল হয়। মাংস চুরি করিলে গৃধ্র, চর্বি হরণে পানকৌড়ী নামে জলচর পক্ষী, তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা, লবণ চুরিতে চীরীবাক্ নামে উচ্চরব কীট এবং দধিচোর ক্ষুদ্র বকপক্ষী হয়। কৌষেয় বস্ত্র হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, ক্ষৌম বস্ত্র হরণে মণ্ডুক, কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, গো হরণে গোধা, গুড় হরণে বাদুড় হয়। উত্তম গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য হরণে ছুঁচা, বাস্তুকাদি, পত্রশাক হরণে ময়ুর, বিবিধ সিদ্ধান্ন হরণে সুজারু, অকৃতান্ন ব্রীহিসবাদি হরণে শল্যক হয়। অগ্নি হরণে বক, গৃহোপযোগী সূপ মুষলাদি হরণে মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহনির্মাণকারী পক্ষ-বিশিষ্ট কীট এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র চুরিতে চকোর পক্ষী হয়। মৃগ অথবা হস্তী হরণে বৃক, অশ্ব হরণে ব্যাঘ্র,

ফল মূল হরণে মর্কট, স্ত্রী হরণে ভল্লুক, পানীয় জল হরণে চাতক পক্ষী, শকট প্রভৃতি যান হরণে উষ্ট্র ও অপরাপর পশু হরণে ছাগ হয়। যে কোন পরদ্রব্য অপহরণ করিলে এবং পুরাতনাদি আহূত হবি ভোজন করিলে অবশ্যই তির্য্যক্ যোনিপ্রাপ্তি হয়। স্ত্রীলোকেরাও ইচ্ছাতঃ পরদ্রব্য হরণ করিলে পূর্বোক্তপ্রকার যোনি সকল প্রাপ্ত হয়। পরন্তু উহারা ঐ পানে ঐ সকল জন্তুর স্ত্রী লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যদি আপদ বিনা অপরকালে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম না করে, তাহা হইলে বক্ষমাণ পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে জন্মান্তরে শক্রর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ স্বকর্মভ্রষ্ট হইলে ছর্দিভক্ষক জ্বালা মুখ প্রেত ও ক্ষত্রিয় ঐরূপ হইলে শব ও বিষ্ঠাভক্ষক কটপূতন নামক প্রেত-বিশেষ বৈশ্য স্বকর্মভ্রষ্ট হইলে পূযভক্ষক মৈত্রাক্ষজ্যোতিক নামক প্রেত হয় এবং স্বকর্মভ্রষ্ট হইলে চৈলাশক নামে প্রেত হয়। যাহার গুহ্যদেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ আছে, তাহাকে মৈত্রাক্ষজ্যোতিক এবং বস্ত্রে যে পোকা থাকে, ও তদ্ভক্ষক প্রেতকে চৈলাশক বলে। বিষয়াত্মারা যে পরিমাণে যে বিষয়ে অত্যন্ত প্রসক্ত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে তাহাদের সেই ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে যাতনা দেয়। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা সেই সকল পাপকর্মের বারংবার অভ্যাসে ইহলোকেও সেই যাতনা প্রাপ্ত হয়; এবং ঘোর তামিস্রাদি নরকে, অসিপত্রবনাদি ও বন্ধনচ্ছেদনাদি নরকে যাতনা অনুভব করে। বিবিধ পীড়ন কাকোলুক কর্তৃক ভক্ষণ, তপ্ত বালুকাদির উপর গমন এবং কুম্ভীপাকাদি অতি ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। দুঃখ প্রায় অপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য দুঃখভোগ করে এবং শীতাতপ-জনিত নানা প্রকার ভয়ানক পীড়া প্রাপ্ত হয়। বারংবার গর্ভবাস, দারুণ যন্ত্রণায় জন্মগ্রহণ, বন্ধনাদি নানা প্রকার কষ্ট এবং পরের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়। বন্ধু ও প্রিয়জন-বিয়োগ, দুর্জনের সহিত সহবাস, কষ্টে ধনার্জন ও তাহার নাশ-কষ্টে মিত্রলাভ এবং পরে তাহার সহিত শক্রতা—পাপীদিগের এইরূপ

নানা দুর্গতি হয়। নিরুপায় জরাদশা, নানাবিধ ব্যাধিদ্বারা পীড়ন, ক্ষুধা পিপাসাদি দ্বারা নানাবিধ ক্লেশ এবং দুর্নিবার অকালমৃত্যু—তাহাদের সংঘটিত হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক—অন্তঃকরণে যে ভাবে যে যে কর্ম আচরিত হয়, সেইভাবের উৎকর্ষ হওয়াতে পরকালে সেইরূপ শরীর দ্বারা ঐ সকল কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। কর্ম সকলের ফলোদয় এই আপনাদিগকে কহিলাম, এক্ষণে যে সকল কর্মে ব্রাহ্মণের মোক্ষ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা—এই সকল কর্ম মোক্ষসাধন। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন এই সকলের শুভ কর্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন কর্ম সর্বাপেক্ষা মোক্ষ সাধন ? ভৃগু উত্তর করিলেন এই সকল মোক্ষসাধন কর্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। উপরোক্ত ছয়টি মোক্ষসাধন কর্মের মধ্যে বৈদিককর্ম আত্মজ্ঞানই ইহকাল, কি পরকাল, সর্বদা, শ্রেয়স্কর জানিবে। পূর্বোক্ত সমুদয় কর্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্মযোগের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ উহারাও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ। বৈদিক কর্ম জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্মফলে মুক্তি লাভ হয়। ইহলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে কোন কামনা করিয়া যে কর্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম বলে, কিন্তু জ্ঞানপূর্বক নিষ্কাম যে কর্ম, তাহাকে নিবৃত্তকর্ম বলে। প্রবৃত্ত কর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায়। আত্মযাজী, সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।* * *

মনুসংহিতার পাপ মুক্তির কতিপয় বিধান

মনুসংহিতায় অসংখ্য প্রকারের পাপ মুক্তির বিধিবিধান দেওয়া আছে। আমরা আগেও জানতে পেরেছি যে পাপপুণ্যের ফলভোগ করার জন্যই জন্মগ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক মুহূর্ত হতে দিন মাস বৎসর যুগ ধরে কত কত পাপ জ্ঞাতভাবে, অজ্ঞাতভাবে করছি তার সীমা সংখ্যা নাই। যাঁরা জড়বাদী, স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁরা সে সমস্তকে গুরুত্ব বা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু গ্রাহ্য না করলেও মনচিত্তে সে সমস্তই সঞ্চিত থাকে। চেতনা স্বচ্ছ, মন পরিমার্জিত হলে তাঁরাই বুঝতে পারেন এবং জন্মান্তরে তপস্যা, দান, ধর্মদ্বারা পাপের স্খালন করার চেষ্টা করেন। মনীষী ব্যক্তিরা তাই পূর্ব হতেই জীবকে পাপ কর্ম হতে বিরত থাকার জন্য সজাগ সচেতন করে দিয়ে থাকেন। আর পূর্বকালের সঞ্চিত পাপের স্খালন জনিত বিধিবিধান দিয়ে গিয়েছেন। মনু-সংহিতা একখানি বিধিবিধানের প্রামাণ্য গ্রন্থ। বহু বহু বিধান এই গ্রন্থে লিখিত রয়েছে। সেখান হতে মাত্র সামান্য কিছু তুলে ধরা হল মাত্র।

লোক সমাজে নিজের পাপ জ্ঞাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্য এবং অধ্যায়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যাহা কিছু দুষ্কর, যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্গম—সমুদয়ই তপস্যা সাধ্য। তপস্যা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকীরা এবং অপরাপর অকার্যকারীরা, সতপ্ত তপস্যাদ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। কীট, সর্প, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী এবং স্থাবরাদি ভূত সকল তপোবলেই স্বর্গে গমন করে। লোক সকল কায়মনো বাক্যে যে কিছু পাপ করে, তপোধনেরা তপোবলে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া থাকেন। যথাশক্তি প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন, পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান এবং অপরাধ সহিষ্ণুতা—ইহারা ব্রহ্মহত্যাদিজনিত মহাপাপ সকলকেও আশু

নাশ করে। একমাস কাল প্রতিদিন যদি ব্যাহৃতি প্রণব এবং শিরোযুক্ত সাবিত্রী স্বরূপ প্রাণায়াম ষোড়শবার জপ করে, তবে ব্রহ্মহত্যা পাপ হতেও মুক্তি পাওয়া যায়। কোসৎ ঋষি দৃষ্ট 'আপনঃ শোশুচদংষ' ইত্যাদি মন্ত্র, বশিষ্ঠ ঋষিদৃষ্ট "প্রতিস্তোমেতিরুষসৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র, "মহিত্রীণামধোহস্তিতি" মহিত্র ঋক্ এবং "শুদ্ধবত্য এতানিন্দ্রং স্তবামহে" ইত্যাদি তিন ঋক্ মন্ত্র একমাস ব্যাপিয়া প্রতিদিন ষোড়শ বার পাঠ করিলে সুরাপায়ীও তাহার পাপ হইতে মুক্ত হয়। অন্য বাসীয়মন্য বামস্য পতিতস্য এতৎ" এই সূক্ত একবার মাত্র পাঠ করিলে, "যজ্জাগ্রতো দূরং" ইত্যাদি শিবসঙ্কল্প মন্ত্রপাঠ করিলে সুবর্ণচৌর তৎক্ষণাৎ উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। 'হবিষ্যন্তং' ইত্যাদি অথবা 'নতংমহো' ইত্যাদি আটটী ঋক্ অথবা সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদি পৌরুষসূক্ত একমাস যাবৎ প্রতিদিন ষোড়শবার অভ্যাস করিলে গুরুদ্বারগামী তৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাপাপ ক্ষয়েচ্ছু ব্যক্তি "অবতি হেলো বরুণয়ো" এই ঋক্ অথবা "যৎকিঞ্চিদং বরুণদেবো" এই ঋক্ কিংবা "ইতি মে মনঃ" এই সূক্ত সংবৎসর ব্যাপিয়া জপ করিবে। অপ্রতিগ্রাহ্য প্রতিগ্রহ করিয়া অথবা গর্হিত অন্নভোজন করিয়া "তরৎসমন্দিধাবতী" এই চারটি ঋক্ তিনদিন ব্যাপিয়া জপ করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। নদীতে স্নান করিয়া "সোমরুদ্রা" ও আর্য্যমণং বরুণং মিত্রঞ্চেতি" তিনটী ঋক্ একমাস অভ্যাস করিলে বহুপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। "ইন্দ্রমিত্রং বরুণাদি" সাতটি ঋক্ ছয় মাস ব্যাপিয়া জপ করিলে পাপী সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।** এবং 'দৈবকৃতস্যৈনম' ইত্যাদি শাকল মন্ত্র দ্বারা সংবৎসর যাবৎ ঘৃত হোম করিলে অথবা 'নম ইন্দ্রশ্চ' ইত্যাদি ঋক্ সংবৎসর পর্যন্ত জপ করিলে মহাপাতজনিত পাপ হইতেও মুক্ত হয়।***

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মান্তর কথন

জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের বাণীর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দিব্যদ্রষ্টা ভগবান রামকৃষ্ণের বাণী অভ্রান্ত। তিনি সুন্দর সুন্দর উপমা সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন জন্মান্তরের স্বীকৃতি। তাঁর বাণীর কিছু কিছু অংশ "গীতাতত্ত্বে রামকৃষ্ণ" গ্রন্থ হতে প্রদত্ত হল।

এক ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়, আপনি জন্মান্তর মানেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে। ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব? কথামৃত—১।৩।৭।৭৬

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রশ্ন করেছিলেন—পরলোক কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—"কেশব সেনও ঐকথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ হয় নাই, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হলে আর এ সংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্যকোন লোকে যেতে হয় না।

"কুমোরেরা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয় দেখ নাই, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে, কাঁচা হাঁড়িও আছে? গরু টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তারদ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকাতে তাল পাকিয়ে দেয়, নতুন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।

"সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে? গাছ আর হয় না। মানুষ

জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নতুন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।" (ক ২।১৩।১।১১১-১২)

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার প্রথম রসদদার পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দিয়াও বুঝাইতেছেন—যে যাহা কিছু করা হোক না কেন ঈশ্বর লাভ করিয়া ভোগ বাসনা শেষ না হইলে পুনর্জন্ম ঘটিবেই।

"জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হল মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় জন্মগ্রহণ করতে হবে না।" ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি? ভোগবাসনা ছিল। গু-পূ ৭।২৪৬

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বলিতেছেন—

ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হলে বাগবাজারে এত লোকছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন? আদাড়েগুলোর হয় না। মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়; কেবল শিমুল, অশ্বত্থ, বট আর কয়েকটা গাছ চন্দন হয় না।

তোমাদের টাকাকড়ির অভাব নাই। যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তারপর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।

পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করার লালসা হয়েছে এরূপ হলে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়।

কিন্তু যাঁহার ভোগলালসা প্রায় সম্পূর্ণ গিয়েছে, তিনি ধনীর গৃহে না জন্মিয়া যোগীর বংশে জন্মলাভ করেন। এরূপ যোগভ্রষ্টের বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন—

"কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়।...যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে

এসে পড়ে—হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে ;—আবার সেই যোগের অবস্থা।

"পূর্বজন্মে যে রাজা ছিল, যার সকল ভোগের অবসান হয়েছে এ জন্মে সেই মুক্ত পুরুষ হতে পারে।"

পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। শুনেছি একজন শব সাধনা করছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখতে লাগল ; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর একজন বাঘের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। শব আর অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, সে নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু জপ করতে করতে মা সাক্ষাৎকার হলেন ও বললেন 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও।" মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে 'মা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছি। যে ব্যক্তি এত খেটে এত আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল ; তাকে তোমার দয়া হল না! আর আমি, কিছু জানি না, শুনি না, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হল!' ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, 'বাছা' তোমার জন্ম জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধন বলে এত জোটপাট হয়েছে, তাই আমার দর্শন পেলে। এখন বল কি বর চাও।" (ক ১।৪।১।৭৯-৮০)

কি জান? অনেকটা পূর্বজন্মের সংস্কারেতে হয়। লোকে মনে করে হঠাৎ হচ্ছে।***

আর দেখ লালাবাবু। এত ঐশ্বর্য ; পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে, ফস করে কি বৈরাগ্য হয়? আর রাণী ভবানী। "মেয়ে মানুষ হয়ে এত জ্ঞান ভক্তি।" ক ২।১৯।২।১৮১

স্বামী নিগমানন্দ ও জন্মান্তরবাদ

প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষদেরই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাঁদের দিব্যদর্শনের বার্তা ও মতবাদ থাকেই। অবতাররা স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিভিন্নরূপে ভাব ব্যক্ত করে যান। তবে মতাবাদের কিনা মতপথের পার্থক্য থাকলেও দিব্য সত্যদর্শনের ক্ষেত্রে সকলেই এক। ভগবানের সৃষ্টিবৈচিত্র্যকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ভাবে দর্শন করেছেন বলে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরবাদের বিচারের ধারা মাত্র ভিন্ন। পারমার্থিক সত্তার সন্নিকট অন্তচেতনার একাত্ম অনুভূতিই সাধক মাত্রেরই ঘটে থাকে। এই একাত্মা অনুভূতিই জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরই ঘটান।

স্বামী নিগমানন্দদেব তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন—

'আমি সাধারণ মানুষ, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিক্রম করে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার পর এই জন্মে ভগবানকে জেনেছি, সত্য লাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ায়, আমার ভিতর দিয়ে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে।"

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ব পূর্ব জীবন-ইতিহাস কিছু কিছু ব্যক্ত করে গেছেন। সম্যক জ্ঞান আয়ত্ত্ব না হলে, কেহই বহু জন্মের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হতে পারেন না।

প্রতি জন্ম মনে হয়ে থাকে নতুন জীবন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এবং প্রতি জীবনের পূর্ব ঘটনা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়ে থাকে। পূর্ব জীবন পরবর্তী জীবনের প্রতি চিত্তে উদাসীনতা প্রায় মানুষেরই থাকে। স্বামী নিগমানন্দের জীবনেও দেখা যায় প্রথমতঃ পরকাল-পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস। কিন্তু সংসার জীবনে স্ত্রী পরলোক গমনের সময় ছায়ামূর্তিতে দর্শন করেই তাঁর পরলোকের ধারণার রূপ বদলিয়ে যায়। তিনি বুঝলেন মৃত্যুই যদি শেষ হত তবে স্ত্রীর প্রেতাত্মা

তাঁর সঙ্গে দর্শন দিতে, কথা বলতে আসে কেন? এই দিয়ে তাঁর সাধন জীবনের আরম্ভ হল। মিডিয়ম, প্লানচেট, সাধু মহাপুরুষ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সহধর্মিণীকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার অতন্দ্র সাধনা চলল। শেষে ভারতীয় সাধনার ধারায় প্রকৃত গুরুর সন্নিকট হতে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করলেন। তত্ত্বজ্ঞানের পরেই তিনি বললেন—"একমাত্র পরলোক রহস্য জানতে পারলেই একে একে তোমরা আরও অনেক কিছু তত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করতে পারবে। শিকল যেমন একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত, পরলোকের সঙ্গেও আর সব তত্ত্ব তেমনি ভাবেই জড়িত। একটায় টান পড়লে আর সবগুলি আয়ত্তাধীনে আসতে বাধ্য। যাঁদের স্বভাবতই ভগবান্ কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাঁরা ভাগ্যবান্, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু অনুশীলন করে যাঁরা ধর্মলাভ করতে চাও, তাদের আমি বলি প্রথমে মৃত্যুতত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন, আলোচনা চর্চা করতে আরম্ভ কর। এই মৃত্যু রহস্য জান্‌তে গিয়েই দেখবে, পরলোক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্ম আপনি এসে হাজির হবেন। একমাত্র পরলোক চিন্তা থেকেই সব লাভ হতে পারে।"

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও বৈষ্ণবীমায়ার অদৃশ্য প্রভাবে একদিন পরলোক পরকালের কোন অস্তিত্ব নাই বলে অস্বীকার করেছিলেন তিনিই সিদ্ধজীবনে বললেন—পরকাল পরলোক, ঈশ্বর ভগবান ব্রহ্ম সবই আছে তার অনুধ্যান করলে সব জ্ঞানই লাভ করতে পারবে মানুষ।

এখন জীব শরীর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"তিনটি দেহের যোগে জীব শরীর। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরই যন্ত্র বা স্থূল দেহের ইঞ্জিন। শুধু আগুনে ইঞ্জিন চলে না। ইঞ্জিনে যেমন কলের অর্থাৎ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ মানব শরীরেরও কলের প্রয়োজন হয়। সূক্ষ্মশরীরই যন্ত্রের বা করণের সমষ্টি। এই করণ হল—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি অন্তকরণ। পাদ, পায়ু, উপস্থ ইত্যাদি

বাহ্যকরণ। সুতরাং সূক্ষ্মশরীর যদি বাইরে চলে যায় তবে স্থূল শরীর মৃত শরীরের ন্যায় হয়, হৃদ-স্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে যায়। আর কারণ-শরীর যদি দেহ হতে বহির্গত হয় তবে নিদ্রিতের মত অবস্থা হয়।"[১]

এই প্রসঙ্গে দেখতে পাই লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী যখন সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতেন তখনকার দেহের বিবরণ দিয়েছেন— ব্রহ্মানন্দ ভারতী —"বাবা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন তখনও তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেহ দেওয়ালটিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকিত।"

এখন এই যে দেহসৃষ্টি হল, ইহা কেন? এবং জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানবের জীবনের কর্তব্য কি? এসম্পর্কে তিনি বলেছেন—'মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া ধর্মজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, যখন স্বাভাবিক ধর্মে সকলকেই ক্রমোন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে, যখন আমরাও একদিন আপনা আপনি উন্নতির চরম সীমানায় উন্নীত হইতে পারিব, তখন স্বাধীন চেষ্টা কেন করিব? একদিন আমরা উন্নতির চরম সীমানায় উঠিতে পারিব বটে কিন্তু সে কত দিনের কথা? কত যুগ কত কল্প কাটিবে, কত শত শত দেহ লয় হইবে, কত ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আপন অধিকারে রহিয়াছে; মানুষ ইচ্ছা করিলে এই জীবনেই উন্নতির চরম সীমানায় উপনীত হইতে পারে। ভগবান্ মানুষকে দয়া করিয়া ঐ শক্তিদান করতঃ তাঁহার সাধের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন।'[২] এই হল জীবনের উদ্দেশ্য। জন্মান্তর ঘটান জীবের লক্ষ্য থাকতে পারে

(১) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথাসংগ্রহ ১০৪ পৃঃ

(২) জ্ঞানীগুরু-পৃষ্ঠা ৩

কিন্তু মানুষের লক্ষ্য হল জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ধর্মবোধকে জাগ্রত করা, স্বরূপের উদ্বোধন করা। এই জন্মান্তর ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কারণ কামনা-বাসনাই জন্মের কারণ যা আগেও বহু আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী নিগমানন্দ দেব বলছেন—"পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম। জন্মান্তর ও পরলোকে সঙ্গে সঙ্গেই যদি মানুষের সকল সম্বন্ধ মুছিয়া যায়, মানুষের সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়, তবে যম নিয়ম, উপাসনাদির আবশ্যক কি? কঠোর সংযম-তপস্যা-বিধানের প্রয়োজন কি? এতদ্দেশ-বাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়াই হিন্দুসতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া পরলোকে বা পরজন্মে পতির সঙ্গে মিলনের জন্য জলন্ত-চিতায় মৃত পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। * * * যদি জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় কর্মফলভোগ প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগরূক থাকিত, যদি আমরা অধ্যাত্মজীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্মফল জনিত অদৃষ্টের কথা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির তলে না চাপিয়া ফেলিতাম, তবে কখনই ইহজীবনকে পাপের আগুন জ্বালিয়া দানবী, দীপ্তিপূর্ণ চাহনিতে বাসনার রসাহুতি লইয়া দাঁড়াইতাম না।

"আবার খৃষ্টীয়ান ও মুসলমানের ধর্মও জন্মান্তর স্বীকার করেন না, কিন্তু স্বর্গাদি লোকান্তর স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—"মানুষ মৃত্যুর পর পাপ বা পুণ্যানুসারে অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে গমন করে। তবে এমন হইতে পারে যে, পাপ ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে যাহার পরিমাণ অল্প, অগ্রে সেই লোকে বাস করিয়া পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে যাইবে। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও অবিচার আরোপ করা হয়। * * *

"অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্তকালের জন্য স্বর্গ-নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। পরব্রহ্মে লীন হওয়াও সম্ভবপর নহে, কেন না স্বর্গ-নরকে জ্ঞান-কর্মাদির সাধনা হয় না। তবে আত্মা

কোথায় যায়? আবার সংসার পানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের কোথাও সমতা নাই। বিবিধ বিষয় বাসনা-বিজড়িত অনন্ত সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসারে অসংখ্য লোকসকল ইহলোকে কেহ না সুখভোগ করিতেছে, কেহ দুঃখদুর্দশায় কষ্ট পাইতেছে, কেহ আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবর্ধিত হইয়া আনন্দে উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া আমোদ-সম্ভোগ করিতেছে, কেহ রোগে শোকে জর্জরিত হইয়া মনোদুঃখে কাল-যাপন করিতেছে। * * * সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি? কারণ—অদৃষ্ট। এই অ-দৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, স্ব স্ব পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন—"কর্মদোষেণ দরিদ্রতা" এই কর্মক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্মের অধীন। গতজন্মে মানুষ যেমন কর্ম করিয়াছে, বর্তমান জন্মে সেই কর্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল প্রদান করিতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

কর্মণা সুখমশ্নাতি দুঃখমশ্নাতি কর্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ততে কর্মণো বশাৎ॥

মানুষেরা কর্মদ্বারা সুখভোগ করে, কর্মদ্বারা দুঃখভোগ করে, কর্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্মদ্বারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম-বশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুই বৎসরের কোন একটি শিশুকে যোগ-যন্ত্রণায় বিকৃতাঙ্গ দেখিলে উহা কর্মফল ভিন্ন কোন্ নির্বোধ পাষণ্ড বলিবে যে, ভগবান্ উহাকে কষ্ট দিতেছেন? এই সমস্ত কারণে আর্যজাতির জন্মজন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং এই পূর্বজন্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসহেতু কি পরলোক, কি আত্মা, কি ঈশ্বর—হিন্দুর নিকট এ-সমস্ত বিষয় স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুধর্মের এ বড় সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন যে, এ জগতের কোন পদার্থের একেবারে ধ্বংস নাই। হিন্দুধর্মেরও সেই মীমাংসা। যদি স্থূলদেহের ধ্বংস না হয়, তবে কামনাময় সূক্ষ্ম মানস-শরীরের ধ্বংস হইবে কেন? স্থূলদেহের পদার্থ সকল মৃত্যুর পর সমজাতীয় পদার্থে মিলিত হয় মাত্র।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে যখন স্থূলদেহের বিনাশ হইতে থাকে, তখন সূক্ষ্মদেহও স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন সমজাতীয় জীবে সমাকৃষ্ট এবং নব জীবনে সমুদ্ভুত হয়। * *

"মানুষ এই দেহেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার বাল্যকালে যে দেহ থাকে, যৌবনে কি সে দেহের কিছু থাকে, না যৌবনে এক নতুন দেহের সৃষ্টি হয়? বাহ্য-বিজ্ঞান মতে প্রতিক্ষণ দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য চলিতেছে। সেই নিত্যসৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য প্রভাবে প্রতিদশ বৎসর অন্তর মানবের নূতন নূতন দেহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে কৌমারের পর যৌবন আসিলে মানুষের যে দেহান্তর, যৌবনের পর প্রৌঢ়েও সেই দেহান্তর এবং প্রৌঢ়ের পর জরায়ও তদ্রূপ দেহান্তর সুতরাং এই কৌমার যৌবন ও জরায় মানুষের কৌমার-মৃত্যু, যৌবন-মৃত্যু এবং প্রৌঢ়-মৃত্যু ঘটিতেছে, কারণ সেই সেই কালে তাহার পূর্বশরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হইয়াছে। জীব যদি এতবার মৃত্যুর পর জীবিত থাকে, তবে জরা মৃত্যুর পর, যে জরায় শরীরের ধ্বংস সাধন হয়, সেই শরীর ধ্বংসের পর সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন? অতএব মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদ্যমান থাকিয়া যে নূতন শরীর ধারণ করে ইহা যুক্তিসিদ্ধ।**

"অতএব হিন্দুধর্মমতে জীবাত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার শেষ হয় না। জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লিঙ্গদেহে অন্বিত হন। লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন এবং ঐ লিঙ্গদেহে ভূলোক অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীলোক হইতে অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন। এই স্থানকেই প্রেতলোক বলে। প্রেতলোকে গিয়া পাপের ফলভোগ করিতে হয়। তৎপর পুণ্যকর্মের ফলভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে গমন করেন, সেখানে পুণ্যকর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে, তখন কর্মক্ষয় হইয়া তাঁহার যে সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে অদৃষ্ট বলে। এই অদৃষ্ট লইয়া জীব আবার ঐ পথে

জগতে আসিয়া গর্ভকটাহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূলদেহ ধারণ করে। সে এক বিচিত্র লীলা—অদ্ভুত কাণ্ড। সংস্কারসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেই সকল বাসনা বিদগ্ধ-জীবাত্মা যে রূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং যেরূপে দেহত্যাগ করে, তাহা যোগীর নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। সাধন ব্যতীত সামান্য জড়চক্ষে তাহা দর্শন বা ব্যবহারিক জ্ঞানে অনুভব করা যায় না।"[১]

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব ছিলেন সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁকে এ সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন করতেন। তিনি উত্তর দিতেন। তার মধ্যে কিছু আলোচনা এখানে দেওয়া হল।

১৯২৮ সালে স্বামী নিগমানন্দদেব ময়ূরভঞ্জপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের রাজা প্রফুল্লকুমার ভঞ্জের প্রার্থনায় বস্তারে যান। তখন তত্রত্য সিভিল সার্জেন Dr. Mitchel কিছু প্রশ্ন করেন।

Dr. Mitchel—মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়?

নিগমানন্দ—আমরা চোখে দেখে থাকি যে কি হয়। স্থূল শরীরটা পরে থাকে। ঠিক এই শরীরের ছাঁচে বায়বীয় লিঙ্গশরীরের প্রাণ বায়ুসহ আপন কৃত কর্মানুসারে উপযুক্ত স্তরে গতি হয়। যেমন একটা ফানুষ তার ভেতরকার বাতাসটি যেরূপ ভারী বা লঘু থাকে, তাকে ছেড়ে দিলে সে উর্ধ্বে উঠে গিয়ে সেই রকম বায়বীয় স্তরে (atmospheric plane) গিয়ে স্থিতিলাভ করে, যেমন যখন একটি কাঠ জ্বলতে থাকলে —তার ধোঁয়া, আগুন, স্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি আগুনের উপর হাওয়ার গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে বার বার আপন আপন ঘনত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে স্থিতিলাভ করে—সে রকম।

এ স্থূল জগৎ ছেড়ে সূক্ষ্মজগৎ বা প্লেন আছে; যে প্লেন বা স্তরে গেলে সেই লিঙ্গশরীর যাতনা অনুভব করে—তাকে বলে নরক বা

। স্বামী নিগমানন্দদেব প্রণীত জ্ঞানীগুরু হইতে সংগৃহীত।

hell আর যে প্লেন বা স্তরে গেলে সুখ ভোগ করে তাকে বলে স্বর্গ।

Dr. Mitchel—সেখানে গিয়ে কি করে?

নিগমানন্দ—মানুষ যেমন কাজ করে—সেই রকম স্তরে যায়। অর্থাৎ যদি পাপ কাজ করে তবে সে যে প্লেনে বা স্তরে যাতনা অনুভব করে সেখানেই যাবে। আর যদি পুণ্যকর্ম করে তবে যেখানে সুখ অনুভব করে সেখানেই যাবে। তবে একটা কথা এই যে জগতে বিশুদ্ধ পুণ্য বা শুধু পাপ তো কেউ করে না, সকলেই পাপপুণ্য মিশ্রিত কাজ করে—অর্থাৎ কিছু পাপ এবং কিছু পুণ্য কাজ করে। কারও পাপ বেশী পুণ্য কম; আবার কারও পুণ্য বেশী, পাপ কম—এইমাত্র তফাৎ। সুতরাং সকলেরই মৃত্যুর পর যন্ত্রণা বা সুখের স্তর অতিক্রম করতে হবে। তবে পার্থক্য এই, যে পুণ্যবান সে দ্রুত যন্ত্রণাময় অবস্থা অতিক্রম করে চলে যায়, যে পাপী, সে তা পারে না, তার সেখানে দীর্ঘকাল ধরে থাকতে হয়।

Dr. Mitchel—কতদিন থাকতে হবে।

নিগমানন্দ—তার কিছু ঠিক নাই। সেটা কর্মের উপর নির্ভর করে।

Dr. Mitchel—মৃত্যুর পর কি করে সুখদুঃখ বা স্বর্গ নরক ভোগ হয়?

নিগমানন্দ—ঠিক যেমন স্বপ্নে তুমি ভয় বা যাতনা পাও। যদি স্বপ্ন দেখ—কেউ তোমাকে কাট্‌তে আস্‌ছে বা একটা বাঘ তোমাকে খেতে আসছে, তুমি নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায়ও ভয় পাও, এও সেইরূপ।

Dr. Mitchel—তারপর কি হয়?

নিগমানন্দ—তারপর কিছুদিন সুখদুঃখভোগ করে সে শরীরটা তত্ত্বে পরিণত হয়। বার বার জন্মায়, মৃত্যু হয়, এইরূপ ক্রমাগত জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ক্রমবিবর্তনে তার অবশেষে মুক্তিলাভ হয়।[১]

১। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথা-সংগ্রহ পৃষ্ঠা—৬২-৬৩।

"মৃত্যুর পরে মানুষের আমিত্ব বা অহংত্বের স্মরণ হয় না। অর্থাৎ সে যে মরেছে সে কথা তার আদৌ মনে থাকে না। স্বপ্নাবস্থায় যেমন বোঝা যায় না আমি স্বপ্ন দেখছি, মৃত্যুর পরেও ঠিক সেই রকম হয়। তখন সে কামনাময় শরীর ধরে যদৃচ্ছা বিচরণ করে। এ অবস্থায় সে হয়ত দেখে যে সে আছে, তার প্রিয়জনরাও আছে। কিন্তু কেউ তাকে দেখেও দেখছে না। কোন প্রিয় সম্ভাষণ করছে না। তখন সে মনে মনে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। এই রকম ধাক্কা খেয়ে খেয়ে শেষে তার চৈতন্য হয়। পুরাণাদিতে যমপুরীতে যে যাতনা ভোগের কথা আছে প্রেতাবস্থায় কষ্ট ভোগের সঙ্গে সে বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। যার সংসারের উপর আসক্তি যত বেশী সে ঠিক সেই পরিমাণ যম-যাতনা ভোগ করে। চৈতন্য লাভ করার পরেই সে কর্মফল ভোগের জন্য স্বর্গে চলে যায়।"

শিষ্য—ভালমন্দ সব কর্মের ফলই তো জীব স্বর্গ ও নরকে ভোগ করে। তবে আর কোন কর্মভোগের জন্য জীবকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়?

নিগমানন্দ—কর্ম ত্রিবিধ। যথা—সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ। যা পূর্ব হতে সঞ্চিত আছে তাকে সঞ্চিত কর্ম বলে। এই জন্মে কোন কর্ম করে বর্তমানে তার ফল ভোগ করছ তাকে ক্রিয়মান কর্ম বলে। আর যে সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তাকে বলে প্রারব্ধ কর্ম।

ধর একজন লোকের খুব ভোগবাসনা আছে। সে ক্রিয়মান কর্মের দ্বারা ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করল। ভোগও করল কিন্তু তৃপ্ত হতে পারল না। সেই অবস্থায় সে মরে গেল পরলোকে স্বর্গ ও নরকে এই ক্রিয়মান কর্মের ফল ভোগ করবে।

এ জন্মে কিছু ভোগ করেছে তার উপর আরও নতুন ভোগ বাসনা জাগ্রত হয়েছিল, ক্রিয়মান কর্মের দ্বারা ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করলেও তৃপ্ত

হওয়ার আগেই তার দেহপাত হল। তাহলে সেই ভোগ-বাসনা সঞ্চিত হয়ে রইল। এই সঞ্চিত কর্মের জন্যই তাকে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

যারা কেবল ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুই আশা করে না, তারা পরলোকে একেবারেই নিত্য ধামে চলে যায়। তারা সপ্তলোক অতিক্রম করে নিত্যলোকে গিয়ে ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হয়। তাদের আর ক্রমমুক্তি-পথে গতি হয় না। কিন্তু যাদের মুক্তির ইচ্ছা আছে কিংবা অন্য কোন ইচ্ছা আছে তাদের ক্রমানুযায়ী সপ্তলোকে কর্মের ফলভোগ করে অবশেষে ক্রমমুক্তির পথে গতি হয়। সুতরাং এ জগতে কেউ যদি ভক্ত হতে না পারে তবে পরলোকে ভক্ত হতে পারবে না।

শিষ্য—যে সপ্তলোকের কথা বললেন তা কাল্পনিক না এই আমাদের পৃথিবীর মতই সত্য?

নিগমানন্দ—এগুলি কল্পিত নয়। ঠিক আমাদের এই পৃথিবীর মতই অনুভবগম্য। আমরা আকাশে যেমন গ্রহ নক্ষত্র দেখছি, সপ্তলোকের স্তরও তেমনিভাবে গঠিত। প্রত্যেক লোকে পৃথক সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই আছে। ভগবানের তো অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড।[১]

সূক্ষ্মদেহের গতি সম্পর্কে আরো বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"সাধারণ মানুষের সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ প্রেতদেহ স্বর্লোক পর্যন্ত থাকে, মহর্লোকে এসে সকলেরই দেহ নষ্ট হয়ে যায়। ধূম মাত্র থাকে। ঐ বায়ুময় দেহ অবলম্বন করে ঊর্ধ্ব দিয়ে যাওয়া যায়। এই মহর্লোকে দেহ পতনের সময়ও যাদের ভোগের কিঞ্চিৎমাত্র ইচ্ছা থাকে তাদের সেখান হতে ভোগের জন্য পতন হয়। কিন্তু ভোগায়তন দেহ অর্থাৎ স্থূলদেহ পায় না বলে একেবারে ভূলোকে এসে দেহ ধারণ করতে হয়। মহর্লোক কেন্দ্রলোক, এ লোক নিচের তিন লোককে আকর্ষণ করে,

১। নীলাচলবাণী পৃষ্ঠা—১০৭-১০৯

আবার উপরের তিন লোককেও আকর্ষণ করে। এখান থেকে নিচের দিকে পতনও হতে পারে, ওপরের দিকে গতিও হতে পারে। এই লোক আত্মাঘন অবস্থাময়। যাদের মহর্লোকেও ভোগের কোন কারণ থাকে না, তারা ক্রমমুক্তির পথে আরোহণ করে, তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ক্রমশ বর্ধিত হয়। আর নীচের লোকগুলি দৃষ্টিপথে ভাসতে থাকে। জনলোকে উঠলে ভূলোক দৃষ্টিগোচর হয়, তপলোকে উঠলে ভূভূবঃ দুটাই দর্শন হয়। সত্যলোকে উঠলে ভূভূবঃ স্বঃ তিনটাই দৃষ্টিতে এসে পড়ে। এসব লোকের উপর আর একটি লোক আছে—যা অন্য সম্প্রদায় জানে না, তা আমাদের এই নিত্যলোক বা ভাবলোক। সে লোকের সবই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ।[১]

শিষ্য—যারা সূক্ষ্মদেহী তাদের কি ছেলে-পিলে হয়?

নিগমানন্দ—হ্যাঁ, তা হয় বৈ কি? তাদের রীতিমত বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে।

শিষ্য—তা কেমন করে সম্ভব? স্থূলের সংযোগ না হলে সন্তান উৎপাদন কেমন করে হতে পারে? সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে কি সংযোগ হয়।

নিগমানন্দ—স্থূলের সংযোগে স্থূলের সৃষ্টি, সূক্ষ্মের সংযোগে সূক্ষ্মের সৃষ্টি। তারা তো সূক্ষ্মদেহী, কাজেই তাদের পারস্পারিক সংযোগে সূক্ষ্ম-দেহেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে। সূক্ষ্মের সৃষ্টিতে স্থূলের প্রয়োজনীয়তা কি?

শিষ্য-তাহলে, স্থূল জগতের মত সূক্ষ্মজগৎ বলেও একটা কিছু আছে?

নিগমানন্দ—হাঁ নিশ্চয়ই, এ জগৎ যেমন নানা প্রকার জীব দ্বারা অধ্যুষিত, সে জগৎও তেমনি। সেখানেও নানাপ্রকার বৈষম্য। আর সে জগৎকে পৃথক ভাবেই বা বল্‌ছি কেন? এ জগতের অন্তরালেই সে জগৎ বর্তমান, প্রত্যেক স্থূলবস্তুর অন্তরালেই তার সূক্ষ্ম শক্তি

১ জীবনী ও বাণী পৃষ্ঠা—১৭৬-১৭৭

বিরাজিত। সূক্ষ্মের দ্বারাই স্থূল জগৎ বিধৃত এবং পরিচালিত। প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা সূক্ষ্ম শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু স্থূলই বা বলি কেন,—এই যে রোগ ব্যারাম হয়, প্রত্যেক রোগেরই এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রয়েছেন, তাদের নিজস্ব শক্তিও রয়েছে। জ্বর, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি যে কোন রোগই বল না কেন, সকল রোগেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। আমি একবার কলেরার দেবতা ওলাদেবীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য—ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, যক্ষ, রক্ষ এরা কি সব প্রকৃতই আছে, না এ সব মানুষের কল্পনা?

নিগমানন্দ—সবই আছে। মানুষ যেমন যেমন সমাজ সংসার নিয়ে আছে, ওরাও তেমনি তাদের সমাজ সংসার নিয়ে আছে। তাদের রাজত্ব পৃথক। মানুষের রাজত্ব স্থূল জগৎ নিয়ে, ওদের রাজত্ব স্থূল সূক্ষ্ম দুই নিয়ে। মানুষ স্থূল দেহধারী, আর ওরাও সূক্ষ্ম দেহধারী, কেউ বা স্থূল-সূক্ষ্মে সংমিশ্রিত। আগে ওরা সমস্ত দেশ জুড়েই বাস করত, মানুষের কাছ হতে সেবা পূজা পেত কিন্তু এখন যতই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, জ্ঞানালোকে দেশ উদ্ভাসিত হচ্ছে ততই ওদের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাসের ভাব এসে পড়ছে, কাজেই এখন তারা মানে মানে লোকালয় ছেড়ে দূর বন জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে। তবে এসব অঞ্চলে তাদের প্রভাব এখনও কমেনি। শ্মশান ঠাকুর, সখা-সখিনী, ডাংধরা প্রভৃতি ওদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ। তারা যে মানুষের উপকার না করে তাও নয়, তবে বাগে পেলে অপকার করতেও ছাড়ে না। ভগবানের রাজত্বে যে কত প্রকারের জীব আছে, তার ইয়ত্তা আছে কি? আমরা স্থূল দেহধারী, কাজেই স্থূল ছাড়া সূক্ষ্মকে সাধারণতঃ বিশ্বাসই করতে চাই না।[১]

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত—পৃষ্ঠা ১৬-১৭

বিভিন্ন রাজ্যের গঠন উপাদান এবং জীবের দেহগত ধাতুরও ভিন্নতা আছে - সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"ভুবর্লোক জলময় দেহ। স্বর্লোক তেজোময় দেহ। ভূত অর্থে গত। ভূত দেখেই বুঝা যায় কে কোন লোকের বাসিন্দা। পিতৃযান ধূম মার্গ, সাধারণ জীবের এই পথেই গতি। আর দেবযান—ক্রমোন্নতির পথ। ভোগাসক্তি যাদের নেই, তাদের এই পথে গতি হয়।

ভোগাসক্ত জীব—জলময় অগ্নিময় দেহ অবলম্বনের পর আর বায়ুময় দেহ অবলম্বন করতে পারে না। তৈজস পরমাণু খসে পড়লে আর বায়ুকে আশ্রয় করে থাকতে পারে না, সুতরাং আবার অগ্নিময়, জলময়, মাটিময় অর্থাৎ স্থূলদেহ ধারণ করে। ভোগাকাঙ্ক্ষা না থাকায় দেবযানের অর্থাৎ ক্রমোন্নতির পথের যাত্রী মহর্লোকে গিয়ে বায়ুকে আশ্রয় করে জন, তপ, সত্যলোকে উপনীত হয়। ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকলেই ভোগদেহ অবলম্বন করতে হয়। যাদের ভোগাসক্তি নেই, তাদের সূক্ষ্মদেহ খুবই লঘু, বায়ু অবলম্বন করে ক্রমেই তারা ক্রমোন্নতির পথে চলে। আর ভোগাকাঙ্ক্ষা যাদের প্রবল, তাদের দেহ অত্যন্ত ভারী, সুতরাং বায়ুকে অবলম্বন করে তারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিছু দূর গিয়েই আবার হয় তাদের নিম্নাভিমুখি গতি। স্বরূপলক্ষণায় হয়—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, আর তটস্থলক্ষণায় হয়—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্বরূপলক্ষণায় উপাসনা করে থাকে। ফল—জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি, অন্তে ব্রহ্মনির্বাণ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—এই তিনে মিলে সগুণব্রহ্ম। জ্ঞানপথ, যোগপথ, ভক্তিপথ—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তসম্প্রদায় ব্রহ্মে লয়, আত্মায় লয় এবং ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয়।[১]

মুক্তি বা লয় প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলেছেন—'লিঙ্গ-শরীর এবং

১নিগমানন্দ উপদেশামৃত—১৬৫

কারণ-শরীর উভয়ই বিনষ্ট হওয়া চাই। কারণ—শরীরে লিঙ্গ-শরীর সূক্ষ্ম বীজাকারে থাকে, এজন্যই সৃষ্টি সম্ভব এবং আবার নিম্নাভিমুখী গতিও হয়। ঈশ্বর মায়াধীশ বটেন, কিন্তু তিনিও আইনে বাঁধা। ব্রহ্মের কারণ-শরীরই ঈশ্বর। ঈশ্বরের ব্রহ্মজ্ঞান নাই। কারণ-শরীরের দ্রষ্টাই হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। কারণ-শরীর—অজ্ঞানাবস্থা। সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনা চলে। সুষুপ্তির মাঝে জ্ঞানের জ্যোতি ফুটে উঠলেই সমাধিলাভ হল। সুষুপ্তি আর সমাধিতে পার্থক্য অনেক। সুষুপ্তিতে অজ্ঞান আর সমাধিতে পূর্ণজ্ঞান। সমাধির পর মানুষ পূর্ণজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসে, আর সুষুপ্তির পর জেগে মানুষ যে অজ্ঞানী সেই অজ্ঞানীর মতই আচরণ করে। ক্রমমুক্তির পথে যারা যায়, মহর্লোকে উঠলেই তাদের ভূর্লোকে আমিত্বের বিস্তার হয়, অর্থাৎ সমগ্র ভূর্লোকটাই নিজের দেহ বলে মনে হয়। জনলোকে উঠলে—ভূ এবং ভুবর্লোকে আমিত্বের ব্যাপ্তি হয়। তপঃলোকে উঠলে—ভু, ভুব ও স্বর্লোকের সঙ্গে আমিত্বের ব্যাপ্তি হয়। সত্যলোকে উঠলে—সমগ্র মহর্লোকে ব্যাপ্তিবোধ আসে। ক্রমমুক্তির পথে ব্যষ্টিজ্ঞান গিয়ে সমষ্টিজ্ঞান এসে পড়ে। ক্রমমুক্তির পথে যাওয়া যায়, সত্যলোকে গিয়ে এক ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। যার লক্ষ্য যেটা, প্রথমে গিয়ে তাতেই লয় হতে হয়। মহর্লোকের উর্ধ্বে যে তিনটি লোক আছে—তাতে জ্ঞানময় ভোগ হয়। ভোগাসক্ত জীব মহর্লোকে গিয়ে জ্ঞানময় ভোগে তৃপ্ত না হতে পেরে আবার স্থূলদেহের পরমাণুকে সংগ্রহ করে নিম্নে নেমে আসে। বায়ুর গতিরও একটা সীমা আছে, বায়ু নিরুদ্ধ হলে আর গতিও সম্ভবপর হয় না।[১]

১ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত—পৃষ্ঠা ১৬৯

মহাপুরুষদের সূক্ষ্মে বিচরণ ও কল্যাণকরণ

সূক্ষ্মদেহে যথেচ্ছা বিচরণের ক্ষমতা প্রায় অনেক মহাপুরুষেরই থাকে 'যোগীরাজ-গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ' হতে একটি ঘটনার অবতারণা করা হল—গোরক্ষপুর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক অতুল বিহারী গুপ্ত এম. এ. বি. টি. 'মৃত্যুর পরেও পুনর্জন্মবাদ' গ্রন্থে যোগিরাজ সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন যাহা যোগিরাজের ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ নীতির কতকটা ব্যতিক্রম। তিনি লিখিয়াছেন—আমি তখন গোরক্ষপুরে। ঐ সহরের গোরক্ষনাথ মহাদেব দেশ প্রসিদ্ধ। সে সময়ে দেবতার মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট কামরায় বাবা গম্ভীরনাথ নামক একজন সন্ন্যাসী থাকিতেন। লোকের বিশ্বাস তিনি সিদ্ধপুরুষ। বহুদূর হইতে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অঘোর বাবু (উক্ত স্কুলের তৎকালীন প্রসিদ্ধ হেড-মাষ্টার রায় সাহেব অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়) ইহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই অপরাহ্নে ইহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমি সময় সময় তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। বাবা অত্যন্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। অঘোর বাবু প্রায়ই বলিতেন যে—বাবা সিদ্ধ মহাপুরুষ, প্রয়োজন হইলে এমন কাজ করিতে পারেন যাহা লোকে অসম্ভব মনে করে। আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতাম না।

"একদিন বুধবার অপরাহ্নে আমি ও অঘোর বাবু স্কুল Compound এ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ খেয়াল হইল, একবার বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অঘোর বাবুকে বলাতে তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন, বড় আশ্চর্য ব্যাপার তো! ঠিক এই ইচ্ছা আমারও হইতেছে। চল এখনই যাওয়া যাক্। আমাদিকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বাবা বলিলেন, তোমাদিগকে এখানে আসিবার জন্য যে আহ্বান পাঠাইয়াছিলাম, তাহা কি পাইয়াছিলে?…ঠিক সেই সময়

দুইজন স্ত্রীলোক বাবার নিকট উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে একজন বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের রমণী মনে হইল, বয়স অনুমান ৬০ বৎসর। অপরা হয়ত তাঁহার দাসী।...বৃদ্ধা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই। 'তাহার একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছে। প্রায় ৪ মাস সে পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহার এক বন্ধুকে তার করায়, উত্তর আসিয়াছে সে বিলাতে নাই ; কোথায় তাহা বন্ধু জানে না।' এই কাহিনী শুনাইয়া বৃদ্ধা হঠাৎ দুই পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল 'বাবা আমাকে দয়া করিতেই হইবে। আমাকে শুধু বলিয়া দিন আমার ছেলে বাঁচিয়া আছে কিনা। বাবা বলিলেন 'আমি দরিদ্র সংসারত্যাগী লোক, বিলাতের সংবাদ কি জানি। বৃদ্ধা বলিলেন— আমি জানি আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার ছেলের সংবাদ আনিতে পারেন। ভগবান্ গোরক্ষনাথের দোহাই, আমাকে দয়া করুন।'

"বাবা এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা দেখি কি করতে পারি। তিনি নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রায় ৪০ মিনিট পরে বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধাকে বলিলেন,— সামনের সোমবারে তোমার পুত্র খুব সম্ভব গোরক্ষপুরে উপস্থিত হইবে। এখন সে জাহাজে। বৃদ্ধার দেখিলাম বাবার উপর অসীম বিশ্বাস। সে ভক্তিভরে প্রণাম করে চলিয়া গেল।

"পরের বুধবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪টার সময় অঘোরবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বাংলোয় উপস্থিত হইলে দেখিলাম একজন সাহেবী পোশাক পরিহিত হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহার সহিত কথপোকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অঘোরবাবু বাংলা ভাষায় বলিলেন ইনি সেই বৃদ্ধার নিরুদিষ্ট পুত্র, বাবার কথা মত পরশু (সোমবার) এখানে আসিয়াছে। বাবার সহিত ইহার মায়ের সাক্ষাৎ হয় ইনি এখনও জানেন না। আমি ইহাকে ও তোমাকে এখনই বাবার নিকট

লইয়া যাইব। বাবাকে আমি মহামানব মনে করি। আজ তোমার বহুদিনের ভুলের মুলোচ্ছেদ হইবে।

বাবা একা পূর্বমত কুটিরের সম্মুখে দালানে বসিয়া আছেন ব্যারিস্টার সাহেব বাবাকে দেখিয়াই বিস্মিত ভাবে বলিলেন – Halo Baba, you here! অঘোরবাবু বিরক্ত ভাবে বলিলেন—বাবা ইংরাজী জানেন না। আমরা সকলে উপবিষ্ট হইলে সাহেব এবার হিন্দীতে বলিলেন—আপনি এখানে কবে আসিলেন? আমি জাহাজ হইতে নামিয়া Imperial Mail ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে গাড়ীতে আপনি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অঘোরবাবু সাহেবকে বলিলেন —তোমার কথায় মনে হইতেছে তুমি বাবাকে অন্য কোনস্থানে দেখিয়াছ! সত্য কি? সাহেব—খুব সত্য। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাই হইতে একদিনের পথ, তখন আমি বাবাকে আমার কেবিনের ঠিক বাহিরে দেখিতে পাই। একজন সাধুকে প্রথম শ্রেণীর নিকট ঘুরিতে দেখিয়া আমি বাহির হইয়া বাবার সঙ্গে ৫ মিনিট কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাহার পর বাবা অন্য দিকে চলিয়া যান।

আমি—আপনার কি মনে পড়ে, কবে কোন সময় আপনি জাহাজে বাবার সহিত কথা কহিয়াছিলেন?

"পাঠক জানেন; ঐ বুধবারে সন্ধ্যার পূর্বে বাবা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া ৪০ মিনিট উহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ সাহেব বলিতেছেন যে, ঐ সময় তিনি বাবাকে জাহাজের উপর দেখিতে পান। এ সমস্যার উত্তর এই যে বাবা সূক্ষ্মদেহে জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ভক্তজন একদিন তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারী বাবাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মানসে বাবার নিকট প্রার্থনা

করেন। বাবা কারও বাড়ি যান না। সেদিন ভক্তটির অনুনয় বিনয় দেখে বাধ্য হয়ে বলতে হল তাঁর বাড়ি যাবেন।

সারাদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়, বাবা আসেন না দেখে ভক্তটি মনে মনে বড়ই আঘাত পান এবং পরদিন বাবার কাছে এসে বলেন আপনি আপনার কথা রাখলেন না। বাবা উত্তর দিলেন—'আমি তো গিয়েছিলাম রে। তুই তো আমায় তাড়িয়ে দিলি। ভক্তটি শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন—সে কি ? তা কি কখনও আমার পক্ষে সম্ভব ? বাবা বললেন "তোর ভাণ্ডার ঘরে একটা কুকুর আহারের জন্য ঢুকতে যাচ্ছিল তুই দুইবার আমায় লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দিলি। আমি তো গেলাম কিন্তু তুই তাড়িয়ে দিলে আর আমি কি করব বল ?"

এ ঘটনা হতে বোঝা যায় যে মহাপুরুষরা তাঁদের যোগৈশ্বর্য বা শক্তি বলে নিজ দেহকে অন্যদেহে রূপান্তর করতে পারেন। একেও এক ধরণের দেহান্তর বলে। একদিকে যেমন তাঁরা নিজ স্থূলদেহকে সূক্ষ্মদেহে পরিণত করতে পারেন অন্যদিকে আবার সূক্ষ্মদেহকে অন্য জীবের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েও নানা প্রকার কাজকর্ম করতে পারেন। সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আরেকটি ঘটনা ভোলাগিরি মহারাজের আসামবাসী শিষ্য নাম অমরনাথ রায়। তাঁর একপুত্র সঙ্কটময় রোগে আক্রান্ত হয়। ছেলেটি খুবই কষ্টভোগ করছে দেখে পিতামাতা স্থির থাকতে পারলেন না। গুরুদেবকে টেলিগ্রাম করে তাঁরা জানিয়ে দিলেন। গুরুদেব উত্তর দিলেন—'যথাসম্ভব জপ ও দান কর।' সেই রাত্রিতেই ছেলেটি রোগমুক্ত হয়ে যায় এবং পিতামাতাকে বলে—"আমি ভাল হয়ে গেছি। গুরুদেব আমার কাছে এসে ছিলেন।' গুরুদেব দেখতে কেমন প্রশ্ন করায় ছেলেটি জানায়—খুব উজ্জ্বল মূর্তি, মাথায় পাগড়ী, পায়ে খড়ম, হাতে কমণ্ডলু, পশ্চাতে একদল সন্ন্যাসী। গুরুদেব কমণ্ডলুর জল হতে জল নিয়ে আমার শরীরে ছিটিয়ে দেওয়ায় আমার শরীরের যোগযন্ত্রণার অবসান ঘটে।' পরে অমরবাবু হরিদ্বারে

গুরুদেবের সন্নিকট গিয়ে মরণাপন্ন পুত্রের সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। গুরুদেব তাতে বলেছিলেন—"তোমরা তো বিশ্বাস করনা যে, চৈতন্য বা পরমাত্মা সর্বব্যাপী। কিন্তু এই দেখ আমি তো আর সুনামগঞ্জে যাইনি? আমি এখানেই রয়েছি। পরমাত্মা সর্বত্র বর্তমান, তিনি দূরে থেকেই একাজ করছেন। সাধন বলে তাঁকে জানতে পারলে তোমরাও সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্ হতে পারবে।"

কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবী ছিলেন তারাকিশোর চৌধুরী। তাঁর জীবনে মানসম্মান খ্যাতির অভাব ছিল না কিন্তু এই সমস্ত সাংসারিক লোভনীয় সম্পদ থাকা সত্বেও অন্তরে আরেক অভাবের বেদনা তিনি সদাই অনুভব করতেন। সেজন্য সাধু সন্তের কাছে সামান্য সামান্য সঙ্গ করতে থাকেন কিন্তু অন্তরের অভাবের নিবৃত্তি হয় না কোন মতেই। রামদাস কাঠিয়াবাবা ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষ। কাঠিয়া বাবার নিকট যাতায়াত করেন কিন্তু দীক্ষা পান না।

একদিন রাত্রিতে তারাকিশোর ঘরের ছাদে শুয়ে আছেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় উঠে বসেন। বসামাত্র দেখেন মহাশূন্য আকাশ হতে কাঠিয়াবাবা উজ্জ্বল মূর্তিতে নেমে এসে ছাদের উপর এসে দাঁড়ালেন। তারপর তারাকিশোরকে 'মন্ত্র' প্রদান করে আবার আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারাকিশোর পরে কাঠিয়াবাবার সন্নিকট সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করেন। এই তারা কিশোর চৌধুরী মহোদয়ই পরবর্তী জীবনে মহাজ্ঞানী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

জীবদেহকে আশ্রয় করে অপর অশরীরীদেহও কাজ করতে দেখা যায়। সূক্ষ্মদেহ জীবের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে। যেমন যেমন জীব তেমন তেমন জীবের সূক্ষ্মশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটে থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম-

লোক হতে সূক্ষ্ম আত্মা আসতো। ঠাকুর বলেছেন—আমারই মত দেখতে এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্তি আমার দেহ হতে বেড়িয়ে এসে উপদেশ দিত। সে বাইরে এলে আমার সামান্য জ্ঞান থাকত, কখনও কখনও বা জড়বৎ হয়ে পড়ে থাকতুম।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও বহু ভক্তের সন্নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। একটি বিশেষ ঘটনা—গলরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ঠাকুরকে শ্যামপুকুরে আনা হয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী সেদিন দেখা করতে এসে ঠাকুর ও ভক্তর কাছে ঘটনাটি বলেছিলেন।

একদিন গোস্বামীজী রুদ্ধঘরের মধ্যে বসে ঈশ্বরের চিন্তা করছেন। সামনে রামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হলেন। গোস্বামীজী তদ্দর্শনে চিন্তা করলেন দক্ষিণেশ্বর ও ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রম বহুদূর। ঠাকুর কি স্থূলদেহেই এসেছেন? পরীক্ষা করার জন্য তিনি হাত পা টিপে দিতে লাগলেন এবং দেখলেন স্থূলদেহই। ঠাকুর মৃদুমন্দ হাঁসছেন। পরে অদৃশ্য হয়ে যান। গোস্বামীজী বলেছিলেন দেশ-বিদেশ, পাহাড়-পর্বত ঘুরে অনেক সাধু দেখেছি কিন্তু এমন সাধু কোন জায়গায় দেখলাম না।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরও সারদাদেবীকে দর্শন দিয়ে শাঁখা সিঁদুর পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।*

তাছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম বিচরণের ঘটনা আছে এখানে একটির উল্লেখ করা হল—

এক সময় 'কামারহাটীর ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তাঁহার নিকটে বামদিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুটো করার মত দেখা যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন

* ঘটনাগুলি প্রায়ই শঙ্করনাথ রায় বিরচিত ভারতের সাধক হতে সংগৃহীত

দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট, জীবন্ত! ভাবিলেন, "এ কি? এমন সময় ইনি কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন?" গোপালের মা বলেন, "আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপাল বলতেন) বসে মুচকে মুচকে হাস্‌ছে। তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশমাসের সত্যকার গোপাল (হাত দিয়া দেখাইয়া)—এত বড় ছেলে বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখপানে চেয়ে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি) বল্‌লে 'মা ননী দাও।' আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জন-মানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হত। কেঁদে বললুম, 'বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা! কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল খেতে দাও বলে। কি করি, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ওঠে সিকে থেকে শুখ্‌নো নারকেল নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম 'বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যে ঐরূপ খেতে দিও না।'

"তারপর জপ সেদিন আর কে করে! গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। যেমন সকাল হোলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চললো—কাঁধে মাথা রেখে। একহাত গোপালের পাছায় ও একহাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলছে।"*

---

* স্বামী সারদানন্দ প্রণীত—'গোপালের মা'।